ভূমিকা

মানবাধিকার অনুশীলন সংক্রান্ত দেশওয়ারি প্রতিবেদন – ২০০৫
গণতন্ত্র, মানবাধিকার ও শ্রম বিষয়ক ব্যুরো কর্তৃক প্রকাশিত
৮ই মার্চ, ২০০৬

সকল নারী ও পুরুষ মর্যাদা ও স্বাধীনতার মধ্যে বসবাস করতে চায় এবং তাদের সে অধিকার রয়েছে। প্রেসিডেন্ট বুশ যেমন বলেছেন, "স্বাধীনতার প্রসার হলো আমাদের সময়ের সবচেয়ে বড় সাফল্য।" মানবাধিকার ও গণতন্ত্রের বিকাশ একটি বিশ্বব্যাপী বৈশিষ্ট্য। গণতন্ত্র এবং গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থায় সুরক্ষিত সার্বজনীন মূল্যবোধগুলো নিয়ে বিশ্বব্যাপী আলোচনা চলছে।

গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থার জন্য ক্রমবর্ধমান দাবীর মধ্যে এই স্বীকৃতির প্রতিফলন ঘটছে যে মানবাধিকারের সবোত্তম রক্ষক হলো প্রাণবন্ত গণতন্ত্র, যেখানে প্রতিনিধিত্বশীল ও জবাবদিহিমূলক সরকারী প্রতিষ্ঠান রয়েছে, যেখানে আইনের শাসনে সমানাধিকার, বলিষ্ঠ সিভিল সমাজ, রাজনৈতিক বহুমত ও স্বাধীন সংবাদ মাধ্যম বিদ্যমান।

যুক্তরাষ্ট্র ও অন্যান্য স্বাধীন দেশগুলোর মানবাধিকার রক্ষা এবং গণতন্ত্রের সুফল বিস্তারে সহায়তা করার ব্যাপারে দায়িত্ব রয়েছে। দেশগুলোকে তাদের গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান বিকাশে আমাদের সহায়তা করতে হবে। এই সব প্রতিষ্ঠান দীর্ঘ মেয়াদে মানবাধিকার সুনিশ্চিত করবে। নাজুক গণতান্ত্রিক দেশগুলো যাতে তাদের নাগরিকদের উন্নত জীবনের ব্যবস্থা করতে পারে, সেজন্য আমাদের সহায়তা করতে হবে। যখন কোন দেশ মানবাধিকার সম্পর্কে তার আন্তর্জাতিক অঙ্গীকার থেকে পিছিয়ে পড়বে, তখন তাকে আমাদের জবাবদিহি করতে বাধ্য করতে হবে। সারা বিশ্বে যে সব সাহসী নারী ও পুরুষ স্বাধীনতার স্বপ্ন নিয়ে আতঙ্কের মধ্যে বসবাস করছে, তাদের পাশে আমাদের সর্বদা দাঁড়াতে হবে।

মানবাধিকার ও গণতান্ত্রিক নীতিমালা রক্ষা করে এবং এগুলোর প্রসার ঘটিয়ে আমরা বিশ্বাস রাখছি আমাদের দেশের সবচেয়ে লালিত মূল্যবোধের ওপর এবং সেই সংগে স্থায়ী শান্তির ভিত্তি রচনা করছি। জাতিসংঘ মানবাধিকার সনদের প্রতিশ্রুতিগুলো পূরণ এবং সারা বিশ্বে প্রাণবন্ত গণতান্ত্রিক শাসন প্রতিষ্ঠা করতে কয়েক প্রজন্মকে কাজ করতে হবে। কিন্তু এই কাজটি এতোই জরুরী যে তা কোন ভাবেই ফেলে রাখা যায় না।

এই সব ভাবনা সামনে রেখে মানবাধিকার অনুশীলন সংক্রান্ত দেশওয়ারি প্রতিবেদন – ২০০৫ যুক্তরাষ্ট্র কংগ্রেসের কাছে উপস্থাপন করতে পেরে আমি আনন্দিত।

কন্ডোলিৎসা রাইস
পররাষ্ট্র সচিব

মানবাধিকার প্রতিবেদন ২০০৫
যুক্তরাষ্ট্র পররাষ্ট্র দফতর

মানবাধিকার চর্চা সম্পর্কিত প্রতিবেদন ২০০৫

ঢাকা, ৮ই মার্চ -- ওয়াশিংটনে গণতন্ত্র, মানবাধিকার ও শ্রম বিষয়ক ব্যুরো কর্তৃক প্রকাশিত যুক্তরাষ্ট্র পররাষ্ট্র দফতরের বার্ষিক প্রতিবেদনের বাংলাদেশ অংশের পুর্ণ বিবরণী নিচে দেয়া হলোঃ

বাংলাদেশ

বাংলাদেশ একটি সংসদীয় গণতন্ত্রের দেশ। এর জনসংখ্যা ১৪ কোটি ৫০ লাখ। প্রধানমন্ত্রী ও বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলের প্রধান বেগম খালেদা জিয়া ২০০১ সালে এক সংসদীয় নির্বাচনে বিজয়ী হয়ে ক্ষমতা গ্রহণ করেন। আন্তর্জাতিক ও দেশীয় পর্যবেক্ষকদের মতে নির্বাচনটি ছিল অবাধ ও সুষ্ঠু। বেসামরিক কর্তৃপক্ষ সাধারণভাবে নিরাপত্তা বাহিনীর ওপর কার্যকর নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখে।
সরকারের মানাধিকার রেকর্ড খারাপ এবং অসংখ্য গুরুতর মানবাধিকার লংঘন করে চলেছে। নিম্নোক্ত মানবাধিকার সমস্যাগুলো সম্পর্কে জানা গেছে।

- বিচারবহির্ভূত হত্যাকান্ড
- নির্বিচারে গ্রেফতার
- রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত সহিংসতা ও হত্যাকান্ড
- নিরাপত্তা বাহিনীকে শাস্তি থেকে রেহাই দেয়া
- দৈহিক ও মানসিক নির্যাতন
- বিচারের আগে দীর্ঘ সময় ধরে আটক রাখা
- গোপনীয়তার ওপর বিধিনিষেধ
- সাংবাদিকদের বিরুদ্ধে সহিংসতা ও বিধিনিষেধ
- ধর্মীয় স্বাধীনতা খর্ব করা
- ব্যাপক সরকারী দুর্নীতি
- নারী ও শিশুর বিরুদ্ধে সহিংসতা
- নারী ও শিশু পাচার
- শ্রমিকদের অধিকারের ওপর বিধিনিষেধ

মানবাধিকারের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন

অনুচ্ছেদ ১ স্বাধীনতাসহ ব্যক্তিসত্ত্বার অখন্ডতার প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন

ক. স্বেচ্ছাচারিতার সংগে বা বেআইনীভাবে জীবন হরণ থেকে অব্যাহতি

নিরাপত্তা বাহিনীগুলো অসংখ্য বিচারবাহির্ভূত হত্যাকান্ড ঘটিয়েছে। পুলিশ, কোস্ট গার্ড, বাংলাদেশ রাইফেলস (বিডিআর), ব্যাপিড অ্যাকশন ব্যাটিলিয়ন (র‍্যাব) অবাঞ্ছিতভাবে মারাত্মক শক্তি ব্যবহার করে।

নিরাপত্তা বাহিনীর সদস্যদের হাতে নিহতের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে (অনুচ্ছেদ ১ গ দ্রষ্টব্য)। প্রায় সব মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনার কোন তদন্ত হয়নি এবং এসব ঘটনায় কারো শাস্তি হয়নি। শাস্তি না পাওয়ার এই পরিবেশ মানবাধিকার লঙ্ঘন ও হত্যাকান্ড অবসানের পথে একটি গুরুতর বাঁধা হয়ে রয়েছে। কয়েকটি ঘটনায় অভিযোগ দায়ের করা হয় এবং যাদের দোষী সাব্যস্ত করা হয়, তাদের বিরুদ্ধে প্রধানত প্রশাসনিক শাস্তি নেয়া হয়। সংবাদপত্রে খবরে প্রকাশ, র‍্যাবসহ বিভিন্ন আইন রক্ষাকারী বাহিনী আলোচ্য বছরে ৩৯৬ জনকে হত্যা করে। সামরিক বাহিনীসহ বিভিন্ন আইন রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যদের নিয়ে আধা সামরিক বাহিনী র‍্যাব গঠিত। এই সব মৃত্যুর সবকটিই ঘটেছে অস্বাভাবিক পরিস্থিতিতে, যখন তারা হয় এই সব বাহিনীর হেফাজতে ছিল বা যখন কোন পুলিশ অভিযান চলছিল। যাহোক, সরকার কিছু চিহ্নিত অবরাধীর মৃত্যুকে বর্ণনা করেছে র‍্যাব বা পুলিশ এবং অপরাধী দলগুলোর মধ্যে ক্রস ফায়ারের ঘটনা হিসেবে। ৩৯৬টি ঘটনার মধ্যে ৩৪০ জন মারা গেছে ক্রস ফায়ারে। এদের মধ্যে ১০৭ জনের জন্য র‍্যাব, ২১২ জনের জন্য পুলিশ এবং ২১ জনের জন্য অন্যান্য নিরাপত্তা বাহিনীকে দায়ী করা হয়। হেফাজতে থাকাকালে প্রহার বা অত্যধিক বল প্রয়োগের কারণে আরো কয়েকজনের মৃত্যু হয়েছে।

নারায়ণগঞ্জ জেলার দোকানদার দেলোয়ার হোসেনকে র‍্যাব গ্রেফতার করার একদিন পর ২১শে ফেব্রুয়ারি ঢকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে সে কমা অবস্থায় ছিল। হাসপাতালের কর্মকর্তারা জানায় যে তার দেহে গুরুতর মানবাধিকার লঙ্ঘন ও মারাত্মক প্রহারের চিহ্ন ছিল। হোসেন পরে মারা যায়। মানবাধিকার তদন্তকারীরা জনায় যে বছরের শেষ নাগাদ তার মৃত্যু সম্পর্কে কোন মামলা দায়ের করা হয়নি বা সরকারী প্রতিবেদন জমা দেয়া হয়নি। তার মৃত্যুর পর র‍্যাব তার বিরুদ্ধে একটি মামলা দায়ের করে। মামলায় তার বিরুদ্ধে ঢাকা-চট্টগ্রাম সড়কের একটি সেতু অতিক্রমকারী যানবাহন থেকে চাঁদা আদায়ের অভিযোগ আনা হয়।

র‍্যাবের একটি দল আওয়ামী লীগের যুব সংগঠনের সদস্য আবদুল কালাম আজাদ সুমনকে খিলগাও থেকে গ্রেফতারের একদিন পর ৩১শে মে'তে তার মৃতদেহ লোকজন বনশ্রীতে দেখতে পায়। প্রত্যক্ষদশীরা স্বাধীন মানবাধিকার তদন্তকারীদের জানায় যে র‍্যাব সুমনকে তার কর্মস্থল থেকে গ্রেফতার করে। রাবের সদস্যরা জানায় যে সুমন বনশ্রীতে একটি অপরাধী দলের সংগে যুক্ত ছিল এবং সে র‍্যাব ও সেই অপরাধী দলের মধ্যে ক্রস ফায়ারে মারা গেছে। র‍্যাব সুমনের বিরুদ্ধে দুটি ফৌজদারি মামলা দায়ের করে। কিছু

সংবাদপত্রের খবরে অভিমত ব্যক্ত করা হয় যে সুমন হয়তো মারা গেছে তার পরিচয় নিয়ে গোলমালের কারণে।

৮ই জুলাই ঢাকা মেট্রোপলিটান পুলিশের (ডিএমপি) গোয়েন্দা শাখা (ডিটেক্টিভ ব্রাঞ্চ–ডিবি) ঢাকার জগন্নাথ কলেজের ছাত্র খন্দকার ইকবাল হোসেনকে গুলি করে হত্যা করে। পুলিশ জানায় যে হোসেন ক্রসফায়ারে গুলি খেয়ে মারা যায়। তার মৃত্যুর পর পুলিশ তার বিরুদ্ধে অবৈধ অস্ত্র রাখা ও ডাকাতির জন্য দুটি মামলা দায়ের করে। স্বাধীন মানবাধিকার তদন্তকারীরা কোন অপরাধ তৎপরতার সংগে হোসেনের জড়িত থাকার কোন প্রমাণ পায়নি। ১৮ই আগস্ট হোসেনের পিতা ডিবির ৯ জন সদস্য এবং একজন ইউনিয়ন কাউন্সিল চেয়ারম্যানের বিরুদ্ধে আদালতে একটি হত্যা মামলা দায়ের করে। পুলিশ এর আগে পুলিশ অফিসারদের বিরুদ্ধে মামলা নিতে অস্বীকার করেছিল। আদালত ডিএমপি কমিশনারকে তদন্ত শুরু করার নির্দেশ দেয়। কিন্তু বছরের শেষ নাগাদ কোন ব্যবস্থা নেয়া হয়নি। র‍্যাব বাহিনী কর্তৃক ২০০৪ সালে জুলাইতে আওয়ামী লীগ কর্মী সুমন আহমেদ মজুমদারকে বিচারবহির্ভূত হত্যা বা ২০০৪ সালের আগস্টে পিচ্চি হান্নানকে বিচারবহির্ভূত হত্যা সম্পর্কে কোন অগ্রগতির খবর পাওয়া যায়নি।

দেশের রাজনীতিতে সহিংসতা সর্বত্র বিরাজমান। এই সহিংসতায় প্রায়ই প্রাণহানি ঘটে। (অনুচ্ছেদ ১ গ ও অনুচ্ছেদ ৩ দ্রষ্টব্য) বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের সদস্যরা এবং প্রায়ই একই রাজনৈতিক দলের বিভিন্ন উপদলের সদস্যরা নিজেদের মধ্যে এবং সভা সমাবেশ ও বিক্ষোভ চলাকালে পুলিশের সংগে সংঘর্ষে লিপ্ত হয়। মানবাধিকার সংগঠনগুলো জানায় যে আলোচ্য বছরে রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত সহিসংসতায় ৩১০ জন মারা যায় এবং ৮৯৯৭ জন আহত হয়। (অনুচ্ছেদ ১ গ, ঘ এবং অনুচ্ছেদ ২ ক দ্রষ্টব্য)।

২৭শে জানুয়ারি উত্তর পূর্বাঞ্চলীয় শহর হবিগঞ্জে আওয়ামী লীগের একটি সমাবেশে গ্রেনেড বিস্ফোরিত হয়ে সাবেক অর্থমন্ত্রী ও আওয়ামী লীগ নেতা শাহ এএমএস কিবরিয়া ও আরো চার জন নিহত হন। ২০শে মার্চ পুলিশ ১০ ব্যক্তির বিরুদ্ধে এই হামলায় জড়িত থাকার জন্য অভিযোগ দায়ের করে। এদের অধিকাংশই স্থানীয় বিএনপি নেতা। অভিযুক্তদের মধ্যে আটজন বছরের শেষ নাগাদ বিচারের অপেক্ষায় আটক ছিল। অপর দুজন এখনো পলাতক রয়েছে।

১৭ই মে অজ্ঞাত বন্দুকধারীরা আওয়ামী লীগের আইন বিষয়ক সেক্রেটারি খোরশেদ আলম বাচ্চুকে ঢাকায় তার বাড়ির কাছে গুলি করে হত্যা করে। বছরের শেষ নাগাদ কোন তদন্ত হয়নি বা কোন মামলাও দায়ের করা হয়নি।

১৭ই আগস্ট দেশের ৬৪ টি জেলার মধ্যে ৬৩টি জেলায় একযোগে বোমা হামলায় দুজন নিহত, প্রায় ১০০ জন আহত হয়। বোম হামলার স্থানগুলোতে পাওয়া লিফলেটগুলো থেকে আভাস পাওয়া যায় যে জামাতুল মুজাহেদিন বাংলাদেশ (এজএমবি) এই বোমা হামলা পরিচালনা করে। ইসলামী আইন (শরিয়া) বাস্তাবায়নের লক্ষ্যে গঠিত এই ইসলামী জঙ্গী দলটিকে সম্প্রতি নিষিদ্ধ করা হয়। বছরের শেষ নাগাদ পুলিশ ও র‍্যাব অসংখ্য সন্দেহভাজন জঙ্গীকে আটক করে ১০ই অক্টোবর ক্রিমিনাল ইনভেস্টিগেশন ডিপার্টমেন্ট (সিআইডি) জেএমবি প্রধান শায়খ আবদুর রহমানের ভাই এবং আরো ছয়জনের বিরুদ্ধে এই বোমা হামলায় জড়িত থাকার জন্য অভিযোগ দায়ের করে। ১১ই সেপ্টেম্বর সরকার ১৭ই আগস্টের বোমা হামলায জড়িত থাকার দায়ে বাংলা ভাই এবং শায়খ আবদুর রহমানকে গ্রেফতারে সহাযতা করতে পারে এমন তথ্য প্রদানের

জন্য পুরষ্কার ঘোষণা করে। বাংলা ভাই প্রাথমিকভাবে পুলিশের সহায়তায় নিজেই অপরাধ বিরোধী অভিযান শুরু করে ২০০৪ সালে। বাংলাভাই ও শায়খ আবদুর রহমান বছরের শেষ নাগাদ পলাতক রয়েছে।

২০০৪ সালের আগস্টে ঢাকায় একটি সমাবেশে গ্রেনেড হামলায় আওয়ামী লীগের মহিলা বিষয়ক সম্পাদিকা আইভি রহমানসহ কমপক্ষে ২০ জন নিহত এবং কয়েকশ' আহত হয়। সেই সমাবেশে আওয়ামী লীগের সভানেত্রী শেখ হাসিনা বক্তৃতা দিচ্ছেলেন। কর্তৃপক্ষ এই হামলার সংগে জড়িত থাকার দায়ে ২০ জনকে গ্রেফতার করেছে।

২০০৪ সালে মে মাসে সিলেটের একটি মাজারে বোমা বিস্ফোরণে কয়েক ব্যক্তি নিহত এবং বৃটিশ রাষ্ট্রদুত আনোযার চৌধুরিসহ কয়েক ডজন লোক আহত হয়। সরকার ঘটনার ব্যাপারে গুরুত্বসহকারে তদন্ত চালায়নি এবং কোন অভিযোগও দায়ের করা হয়নি।

আইন নিজের হাতে নিযে মানুষ হত্যা একটি সাধারণ ব্যাপার। সংবাদপত্রগুলো আলোচ্য বছরের প্রথম আট মাসে ২০৬ টি ঘটনার খবর দিয়েছে। ২৬শে মার্চ জনতা নরসিংদী জেলায় পাঁচজন কথিত ডাকাতকে পিটিয়ে হত্যা করে। ২১শে এপ্রিল ঢাকার ম্াতুয়াইলে জনতা দুজন কথিত চাঁদাবাজকে পুড়িয়ে মারে। ১৯শে জুন জনতা খুলনায় দুজন কথিত চাঁদাবাজকে এবং বাগেরহাটে একজনকে হত্যা করে।

ভারতের সংগে সীমান্তে সহিংসতা একটি সমস্যা হয়ে রয়েছে। স্থানীয় মানবাধিকার সম্পর্কিত বেসরকারী সংস্থাগুলো (এনজিও) নিরাপত্তা বাহিনীর সদস্যদের হাতে ১০৪ জন নিহত এবং ৬৬ জনের আহত হবার খবর দিয়েছে। সংবাদপত্রে খবরে জান যায় যে বিএসএফ সদস্যরা এবং অন্যান্য ভারতীয়রা ২০০০ সালের জানুয়ারি থেকে আলোচ্য বছরের শেষ নাগাদ সীমান্ত গ্রামগুলোতে ৪৬১জনকে হত্যা করেছে। ২৭শে মে'তে বাংলাদেশের নিরাপত্তা বাহিনীগুলো মৌলভীবাজার এলাকায় ৬ জন কথিত ভারতীয় বিদ্রোহীকে হত্যা করেছে।

খ. নিখোঁজের ঘটনা

আলোচ্য বছরে নিখোঁজ ও অপহরণ একটি সমস্যা হয়ে রয়েছে। সংবাদপত্রে খবরে জানা যায় যে জুনয়ারি থেকে আগস্টের মধ্যে ৩৩৫ জন অপহৃত হয়, এদের মধ্যে ৯৩ জন অপহৃত হয় রাজনৈতিক কারণে। অর্থের জন্য অপহরণ একটি সমস্যা হয়ে রয়েছে। ২৬শে মার্চ রাঙামাটির একটি গ্রাম থেকে ১৪ জনকে অপহরণ করা হয়। আটককারীরা গ্রামবাসীদের মুক্তিপণ হিসেবে ১৫,১৫০ ডলার (১০ লাখ টাকা) দাবী করে। স্থানীয় সাংবাদিকরা জানায় যে কয়েকদিন পর গ্রামবাসীদের মুক্তি দেয়া হয়। গ্রামবাসীরা কোন মুক্তিপণ দেয়ার কথা অস্বীকার করে যাতে তারা আবার অপহরণের শিকার না হয়।
১২ই আটস্ট, র‍্যাবের একটি দল বিএনপি নেতা ও ব্যবসায়ী জামালউদ্দীন আহমেদ চৌধুরিকে অপহরণে সংশ্লিষ্টতার জন্য শহীদ চেয়ারম্যানকে গ্রেফতার করে।

গ. নির্যাতন ও অন্যান্য ধরনের নিষ্ঠুর, অমানবিক অথ্যবা অবমাননাকর আচরণ বা শাস্তি

আইনে নির্যাতন ও নিষ্ঠুর, অমানবিক বা অবমাননাকর আচরণ নিষিদ্ধ থাকলেও নিরাপত্তা বাহিনীগুলো, র‍্যাব ও পুলিশ গ্রেফতার ও জিজ্ঞেসাবাদের সময় নিয়মিতভাবে দৈহিক ও মাসনিক নির্যাতন সেই সংগে নিষ্ঠুর, অমানবিক ও অবমাননাকর আচরণ করে থাকে। নির্যাতনের মধ্যে হুমকি, প্রহার ও বৈদ্যুতিক শক অন্তর্ভুক্ত। বাংলাদেশ রিহ্যাবিলিটেশন সেন্টার ফর ট্রমা ভিকটিমস জানায় যে নিরাপত্তা বাহিনীর হাতে আলোচ্য বছরে ২,২৯৭ জন নির্যাতনের শিকার হয় এবং ১৫ জনের মৃত্যু হয়। (অনুচ্ছেদ ১ ক, ঘ এবং অনুচ্ছেদ ২ ক দ্রষ্টব্য)সরকার অভিযুক্ত ব্যাক্তিদের বিরুদ্ধে কদাচিৎ অভিযোগ দায়ের করে, সাজা বা শাস্তি দেয়। শাস্তি থেকে অব্যাহতি পাওয়ার এই পরিবেশ পুলিশকে মানবাধিকার লঙ্ঘন চালিয়ে যাওয়ার সুযোগ দেয়।

১৫ই জুলাই, র‍্যারের তিনজন সদস্য আবু বাকার সুলাতানকে লাঞ্ছিত করে। র‍্যাব সদস্যরা তখন ডিউটিতে ছিল না। সুলতান ঢাকার কাছে উত্তরায় র‍্যাব সদস্যদের একজন ড্রাইভারকে মারতে নিয়েধ করেছিল। র‍্যাব সদস্যরা সুলতানকে চোখ বেঁধে এবং হাতকড়া পরিয়ে উত্তরায় তাদের দফতরে নিয়ে যায়। সেখানে তারা তাকে একটি গাছের সংগে বেঁধে উপর্যুপরি লাথি ও ঘুসি মারে এবং লোহার রড ও হাতুড়ি দিয়ে পেটাতে থাকে। সুলতানের সংগে পরিচিত র‍্যাবের একজন কর্মকর্তা হস্তক্ষেপ করলে র‍্যাব তাকে মুক্তি দিয়ে একটি হাসপাতলে ভর্তি করে। তার হাতপা'র কয়েক জায়গায় ভাঙা ও ফোলা ছিল। ২৪শে জুলাই সংবাদপত্রগুলো জানায় যে র‍্যাব কর্তৃপক্ষ তিন জন অফিসারকে প্রত্যাহার করে তাদের মুল দফতর পুলিশ বিভাগে ফেরত পাঠিয়েছে। পুলিশ এই ঘটনার সংগে সংশ্লিষ্ট আরো দশ জনকে দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি দিয়েছে।

বাংলাদেশ মানবাধিকার বাস্তবায়ন সংস্থা (বিএসইএইচআর) আলোচ্য বছরে আইন রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যদের কর্তৃক ধর্ষণের ছটি ঘটনার কথা জানিয়েছে। অধিকাংশ এনজিও জানিয়েছে যে যৌন নিপীড়নের প্রকৃত সংখ্যা অনেক বেশি, যা সামাজিক বাঁধানিষেধের কারণে অজ্ঞাত থেকে যায়।

২৮শে জুলাই দাঙ্গা পুলিশের একজন অফিসার ঢাকায় একটি বাস স্টেশনে অপেক্ষমাণ এক মহিলাকে দেখতে পেয়ে তাকে তার বাড়ির কাজে নিয়োগের কথা বলে। তাকে তার বাড়ি নিয়ে যাওয়ার পরিবর্তে একটি হোটেলে নিয়ে যায় এবং হোটেলের এক পুরুষ কর্মচারীর সহায়তায় ধর্ষণ করে। মহিলাটি একটি ধর্ষণের মামলা দায়ের করে। বছরের শেষ নাগাদ মামলাটির তদন্ত চলছিল।

বিএসইএইচআর জানায় যে ডলি খাতুনের পরিবারকে ক্ষতিপুরণ হিসেবে পুলিশ ৩ হাজার ডলার (২ লাখ টাকা) দিলে সে তার জবানবন্দী পাল্টে পুলিশের বিরুদ্ধে তার মামলা প্রত্যাহার করে নেয়। ২০০৪ সালের ডিসেম্বরে ১৪ জন পুলিশ তাকে ধর্ষণ করেছিল। পুলিশ দাবী করে যে এনজিওগুলো ডলি খাতুনকে পুলিশের বিরুদ্ধে মিথ্যা সাক্ষ্য দেয়ার জন্য চাপ দিয়েছিল।

ধর্ষণ ও নির্যাতনের জন্য অভিযুক্ত আইন রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যদের বিরুদ্ধে সাধারণতঃ তদন্ত করা হয় না। কোন কোন ক্ষেত্রে পুলিশ ধষিতা মহিলাকে নিরাপত্তা হেপাজতে রাখে। নিরাপত্তা হেফাজত প্রকৃতপক্ষে কারাগারের সেল, যেখানে তাদের খারাপ পরিবেশের সম্মুখীন হতে হয়। কখনো কখনো তাদের নির্যাতন ও ধর্ষণেরও শিকার হতে হয় (অনুচ্ছেদ ৫ দ্রষ্টব্য)।

মানবাধিকার গ্রুপগুলো এবং সংবাদপত্রের খবর সূত্রে আভাস পাওয়া যায় গ্রামাঞ্চলে কথিত নৈতিক অপরাধে মহিলাদের বিরুদ্ধে প্রায়ই ফতোয়ার মাধ্যমে বিচার বহির্ভূত বেত্রাঘাতসহ বিভিন্ন ধরনের শাস্তি প্রদান করা হয়। (অনুচ্ছেদ ২ গ দ্রষ্টব্য)। একটি মানবাধিকার সংগঠন দৈহিক শাস্তি ও সামাজিকভাবে এক ঘরে রাখার ৩৫টি ঘটনা লিপিবদ্ধ করেছে।

প্রেমে প্রত্যাখ্যাত, ক্রুদ্ধ স্বামী অথবা প্রতিশোধপরায়ণ ব্যক্তিরা কখনো কখনো প্রতিশোধ হিসেবে মহিলাদের মুখে এসিড ছুড়ে মারে (অনুচ্ছেদ ৫ দ্রষ্টব্য)।

কারাগার ও আটক কেন্দ্রের অবস্থা

কারাগারের অবস্থা করুণ এবং কারা হেফাহতে মৃত্যুর এটা একটি কারণ। সংবাদপত্রের খবরে জানা যায় যে কারাগারে মারা গেছে ৭৬ জন, পুলিশ ও অন্যান্য নিরাপত্তা বাহিনীর হেফাজতে মারা গেছে ২১০ জন। (অনুচ্ছেদ ১ ক দ্রষ্টব্য) সব কটি কারাগারেই ধারণ ক্ষমতার বেশি বন্দী রয়েছে এবং এগুলোতে পর্যাপ্ত সুযোগ সুবিধার অভাব রয়েছে। সরকারী পরিসংখ্যানে আভাস পাওয়া যায় যে কারাগারগুলোতে মোট বন্দীর সংখ্যা ৭৬,৩২৮, যা ধারণ ক্ষমতার তিনগুণ। একটি মানবাধিকার সংগঠনের হিসাবে কারাগারগুলোর ধারণ ক্ষমতা ২৭,৫৪৫। বন্দীদের মধ্যে ৫১,৮০১ জন বিচারের অপেক্ষায় আছে এবং ২৪,৩১৭ বন্দী সাজাপ্রাপ্ত। অধিকাংশ ক্ষেত্রে কারাকক্ষগুলোতে বন্দীদের এতোই ভীড় যে তাদের পালা করে ঘুমাতে হয়।

আইনে কিশোর বন্দীদের বয়স্কদের থেকে আলাদা করে রাখার কথা থাকলেও সুবিধার অভাবে কিশোরদের কার্যত বয়স্কদের সংগে রাখা হয়। ৯ই জুলাই ঢাকা মেট্রোপলিটান ম্যাজিস্ট্রেট ৯ বছরের একটি বালককে একটি ফৌজদারি মামলা থেকে মুক্তি দেন। একটি স্থানীয় মানবাধিকার সংগঠন তার নিয়মিত কারাগার পরিদর্শনকালে বালকটি দেখতে পেয়েছিল। বিচারের অপেক্ষায় থাকা বন্দীদের সাজাপ্রাপ্ত বন্দীদের থেকে আলাদা করে রাখা হয় না।

আইনে নিরাপত্তা হেফাজতে থাকা মহিলাদের অপরাধীদের থেকে আলাদা রাখার কথা বলা হলেও পৃথক কোন ব্যবস্থা নেই।

সাধারণভাবে সরকার আন্তর্জাতিক রেডক্রস কমিটি (আইসিআরসি)সহ স্বাধীন মানবাধিকার পর্যবেক্ষকদের কারাগার পরিদর্শনের অনুমতি দেয় না। প্রতিটি কারাগার এলাকায় বিশিষ্ট ব্যক্তিদের নিয়ে সরকার গঠিত কমিটি প্রতি মাসে কারাগার পরিদর্শন করে, কিন্তু তার প্রাপ্ত তথ্য প্রকাশ করা হয় না। জেলা জজ মাঝে মধ্যে কারাগার পরিদর্শন করেন, কিন্তু এ সম্পর্কে তথ্য কাদচিৎ প্রকাশ করেন।

ঘ. বলপুর্বক গ্রেফতার বা আটক

আইনে বলপূর্বক গ্রেফতার ও আটক নিষিদ্ধ। কর্তৃপক্ষ প্রায়ই এই নিষেধাজ্ঞা এমনকি অনিবর্তনমুলক আটকের ক্ষেত্রেও লঙ্ঘন করে থাকে। আইনে কিছু সুনির্দিষ্ট রক্ষা ব্যবস্থাসহ নিবর্তনমুলক আটকের এবং কোন ম্যাজিস্ট্রেটের আদেশ বা কোন গ্রেফতারি পরোয়ানা ছাড়াই আটকের ব্যবস্থা রয়েছে। সরকার

স্বেচ্ছাচারিতার সংগে গ্রেফতার ও আটক করে এবং কোন প্রকার সুনির্দিষ্ট বা আনুষ্ঠানিক অভিযোগ ছাড়াই নাগরিকদের আটক করতে ১৯৭৪ সালের বিশেষ ক্ষমতা আইনের মতো জাতীয় নিরাপত্তা আইন ব্যবহার করে থাকে।

পুলিশ ও নিরাপত্তা বাহিনীগুলোর ভূমিকা

পুলিশ স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের অধীনে জাতীয়ভাবে সংগঠিত একটি বাহিনী। এর দায়িত্ব হলো অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা ও সাধারণ আইন শৃঙ্খলা বজায় রাখা। পুলিশ সাধারণভাবে অকার্যকর এবং ক্ষমতাসীন দলের সংগে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে তদন্ত করতে অনিচ্ছুক থাকে। সরকার প্রায়ই পুলিশকে রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে ব্যবহার করে থাকে।

পুলিশের বিভিন্ন ইউনিট ও সামরিক বাহিনীসহ বিভিন্ন নিরাপত্তা বাহিনী থেকে নেয়া সদস্যদের নিয়ে গঠিত উন্নততর প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত পুলিশ ইউনিট র‍্যাব পুলিশ বাহিনীর সার্বিক সংস্কারের উদ্দেশ্যে পরিকল্পনা প্রণয়ন করেছে। কিন্তু মানবাধিকার সমস্যা নিরসনের উদ্দেশ্যে কোন সুনির্দিষ্ট পদক্ষেপ নেয়া হয় নি। র‍্যাব নিজেই গুরুতর মানবাধিকার লঙ্ঘন করেছে।

পুলিশ বাহিনীর মধ্যে ব্যাপক দুর্নীতি রয়েছে। পুলিশ বাহিনীর সম্পদ, প্রশিক্ষণ ও শৃঙ্খলারও অভাব রয়েছে। পুলিশ নির্যাতনের শিকার ব্যক্তিরা পুলিশের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করতে অনিচ্ছুক থাকে কেননা পুলিশ বাহিনীর সদস্যদের রিবুদ্ধে ফৌজদারি অভিয়োগের তদন্ত করার জন্য কোন স্বাধীন সংস্থা নেই। যৌথ অভিযান দায়মুক্তি আইনের বৈধতা নিয়ে প্রশ্নের কোন সুরাহা আলোচ্য বছরে হয় নি। এই দায়মুক্তি আইন ২০০৩ সালে অপারেশন ক্লিনহার্টের সময় সংগঠিত মানিবাধিকার লঙ্ঘনের প্রতিকার চাওয়ার ক্ষেত্রে বাঁধা সৃষ্টি করেছে।

দীর্ঘ বিচার প্রক্রিয়া এবং নিজের ও নিজের পরিবারের বিরুদ্ধে প্রতিশোধের ভয়ে বাদীরা কদাচিৎ পুলিশের বিরুদ্ধে ফৌজদারি মামলা দায়ের করে থাকে। এই অবস্থা পুলিশের জন্য অপরাধ করে পার পেয়ে যাওয়ার একটি পরিবেশ সৃষ্টি করেছে।

গ্রেফতার ও আটক

আইনে সকল মামলায় গ্রেফতারী পরোয়ানা ব্যবহারের কথা বলা হয়নি। ফৌজদারী দণ্ড বিধির ৫৪ ধারা এবং ঢাকা মেট্রোপলিটান পুলিশ অধ্যাদেশের (ডিএমপি) ৮৬ ধারায় কোন ম্যাজিস্ট্রেটের আদেশ বা গ্রেফতারি পরোয়ানা ছাড়াই অপরাধমূলক কাজে সংশ্লিষ্ট থাকার সন্দেহে যে কোন লোককে গেফতারের সুযোগ রয়েছে। সরকার আনুষ্ঠানিক বা সুনির্দিষ্ট অভিযোগ ছাড়াই নিয়মিতভাবে লোকজনকে গ্রেফতার করে থাকে। আলোচ্য বছরে সরকার এই অধ্যাদেশগুলোর অপব্যবহার করেছে এবং প্রায়ই রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে গণ প্রেফতার অব্যাহত ছিল। স্থানীয় মানবাধিকার এনজিও "অধিকার" জানিয়েছে যে পুলিশ আলোচ্য বছরের জানুয়ারি থেকে আগস্ট পর্যন্ত সময়ে ৫৪ ধারায় ৩,৯১২ জনকে এবং ডিএমপি অধ্যাদেশের ৮৬ ও ১০০ ধারায় ঢাকা মেট্রোপলিটান এলাকায় আরো ২৫,৩৭৪ জনকে গ্রেফতার করে।

সরকার বিরোধী মত প্রকাশের শাস্তি হিসেবে লোকজনকে আটক করার উদ্দেশ্যে কর্তৃপক্ষ ৫৪ ও ৮৬ ধারা ব্যবহার করেছে। ২০০৫ সালের অক্টোবরে বিরোধী দলের পরিকল্পিত সমাবেশের আগে পুলিশ ২০০৪ সালের সেপ্টম্বরে বিরোধী দলের বিপুল সংখ্যক সদস্যকে আটক করে। মানবাধিকার সংগঠনগুলোর আর্জির পরিপেক্ষিতে হাইকোর্ট পুলিশকে ২০০৪ সালের অক্টোবর পর্যন্ত কোন লোককে ৮৬ ধারায় গ্রেফতারে বিরত থাকার নির্দেশ দেয়। পুলিশ অবশ্য ৫৪ দারায় গ্রেফতার অব্যাহত রাখে। আইনে দ্রুত বিচার বিভাগীয় ব্যবস্থা গ্রহণের কথা থাকলেও তা কদাচিৎ কার্যকর করা হয়।

বিশেষ ক্ষমতা আইনে সরকার বা কোন জেলা জজ কোন ব্যক্তিকে রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তার প্রতি ক্ষতিকর কোন কাজ থেকে বিরত রাখতে ৩০ দিন পর্যন্ত আটক করার নির্দেশ দিতে পারে। কিন্তু বন্দীদের আরো দীঘ সময়ের জন্য আটক রাখা হয়। বিশেষ ক্ষমতা আইনের মামলায় ম্যাজিস্ট্রেটকে বন্দীকে তার আটকের ১৫ দিনের মাথায় আটকের কারণ জানাতে হবে। একটি উপদেষ্টা পরিষদ বিশেষ ক্ষমতা আইনের মামলাগুলো প্রতি চার মাস অন্তর পরীক্ষা করে দেখার কথা। বন্দীদের আপিল করার অধিকার রয়েছে।

নিয়মিত আদালতগুলোতে জামিন দেয়ার একটি ব্যবস্থা কার্যকর রয়েছে, যদিও কতিপয় নিরাপত্তা ও অপরাধ সংক্রান্ত আইনে বিনা জামিনে আটক রাখার বিধান রয়েছে। ২০০৪ সালের আগস্টে হাইকোর্ট ৩৬০ দিনের বেশি সময় ধরে বিনা বিচারে আটক ৭,৪০০ জনের বেশি বন্দীকে জামিনে মুক্তির নির্দেশ দেয়। বছরের শেষ নাগাদ এদের কাউকেই মুক্তি দেয়া হয় নি। ফৌজদারি মামলায় আটক বন্দীদের উকিলের সাথে সাক্ষাৎ করার সুযোগ দেয়া হয়। কিন্তু উপদেষ্টা বোর্ডের সামনে কোন আইনজীবীকে বন্দীর পক্ষে প্রতিনিধিত্ব করতে দেয়া হয় না। বিবাদীর জন্য রাষ্ট্রীয় অর্থে আইনজীবী নিয়োগ করা হয় কদাচিৎ। আইনী সহায়তা কার্যক্রমের সংখ্যাও গুটি কয়েক। অভিযোগ দায়ের করার পরই কেবল আইনজীবীদের সুযোগ দেয়া হয়। আইনী প্রতিনিধিদের ৫৪ ধারায় আটক বন্দীদের সাথে সাক্ষাৎ করার সুযোগ দেয়া হয়। পুলিশ কার্যত আইনজীবীদের এই সব ধারায় গ্রেফতারকৃতদের সাথে পরামর্শ করার অনুমতি কদাচিৎ দিয়ে থাকে। স্বেচ্ছাচারিতার সংগে গ্রেফতার একটি সাধারণ ঘটনা। সরকার রাজনৈতিক কর্মীদের মুক্তি আটকে রাখার উদ্দেশ্যে তাদের ধারাবাহিকভাবে আটক রাখে। (অনুচ্ছেদ ৪ দ্রষ্টব্য) বিরোধী রাজনৈতিক দলের সদস্য ও তাদের পরিবারগুলোকে হয়রানি ও ভয় দেখানোর উদ্দেশ্যে ৫৪ ও ৮৬ ধারা প্রয়োগ করে থাকে। কোন বিক্ষোভ সমাবেশের পুর্বে ও অনুষ্ঠানের সময় পুলিশ কোন আইনগত কর্তৃত্ব ছাড়াই বিরোধী রাজনৈতিক কর্মীদের বিক্ষোভ- সমাবেশ শেষ না হওয়া পর্যন্ত আটকে রাখে (অনুচ্ছেদ ২খ দ্রষ্টব্য)। ৪ঠা জুন পুলিশ জাতীয় পার্টির চেয়ারম্যান ও সাবেক প্রেসিডেন্ট হোসেন মোহাম্মদ এরশাদের স্ত্রী বিদিশা এরশাদকে রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে অর্থ পাচার, চুরি ও স্বামীকে হত্যার অভিযোগে গ্রেফতার করে। আটকের ২৩ দিন পর তিনি মুক্তি পেলে তার বিরুদ্ধে ব্যাংক একাউন্টে টাকা না রেখে চেক দেয়ার অভিযোগে নতুন ওয়ারেন্ট জারি করা হয়। সাবেক প্রেসিডেন্ট এরশাদের একজন কর্মচারি অভিযোগ করে যে বিদিশা তাকে দুই কোটি টাকার (তিন লাখ ডলার) চেক দিয়েছে যা ব্যাংক থেকে ফেরত এসেছে। বিদিশা তার বিরুদ্ধে আনীত চতুর্থ অভিযোগ থেকে জামিন লাভ করেছেন। বছরের শেষ নাগাদ তার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগগুলো অনিষ্পন্ন রয়েছে।

রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে আটক বন্দীর সংখ্যা হিসাব করা কঠিন। অনেক রাজনৈতিক কর্মীর বিরুদ্ধে ফৌজদারি অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে এবং অনেক অপরাধী নিজেদের রাজনৈতিক কর্মী বলে দাবী করে। এই ধরনের আটক কয়েক দিন থেকে কয়েক সপ্তাহ হতে পারে। অধিকাংশ ক্ষেত্রে বিবাদী জামিন পেয়ে থাকে। কিন্তু তাদের বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ খারিজ বা খালাস পেতে কয়েক বছর লেগে যেতে পারে।

একটি স্থানীয় মানবাধিকার সংগঠন জানায় যে রাজনৈতিক হানাহানিতে ৩১০ জন মারা গেছে এবং আহত হয়েছে ৮,৯৯৭ জন। আলোচ্য বছরে পুলিশ রাজনৈতিক কারণে ১২১৬ জনকে গ্রেফতার করে। এদের অধিকাংশকেই আটক রাখা হয় সংক্ষিপ্ত সময়ের জন্য (অনুচ্ছেদ ১ ক ও গ এবং ২ ক দ্রষ্টব্য)।

বিচারের পূর্বে স্বেচ্ছাকৃতভাবে দীর্ঘ সময় ধরে আটক রাখা একটি সমস্যা। পুঞ্জিভূত ফৌজদারি মামলার সংখ্যা প্রায় ৪০ হাজার। এছাড়া, আইন মন্ত্রণালয়ের এক সাম্প্রতিক জরিপে দেখা যায় ১,০১৩ বন্দী কমপক্ষে ছয় মাসে কোন কোর্টে হাজির হয়নি। এদের অনেকে এতো দীর্ঘ সময় ধরে আটক আটক আছে যে তা তাদের বিরুদ্ধে যে কথিত অপরাধের অভিযোগ রয়েছে, তার সর্বোচ্চ সাজার চেয়েও বেশি। অধিকার জানয় যে কারাগারে আটক বন্দীদের প্রায় ৭৫ শতাংশই বিচারের অপেক্ষায় রয়েছে।

৬. সুষ্ঠু প্রকাশ্য বিচারের অস্বীকৃতি

আইনে স্বাধীন বিচার ব্যবস্থার কথা থাকলেও সংবিধানের একটি অস্থায়ী বিধান অনুযায়ী নিম্ন আদালত নির্বাহী শাখার অধীনস্থ রাখা হয়। বিচারকদের নিযুক্তি ও বেতন নির্বাহী শাখার ওপর নির্ভরশীল বলে আদালত বহুলাংশে নির্বাহী শাখার প্রভাবাধীন। উচ্চ আদালত কিছুটা স্বাধীনতা প্রদর্শন করে এবং প্রায়ই ফৌজদারি, দেওয়ানী ও রাজনৈতিকভাবে বিতর্কিত মামলাগুলোতে সরকারের বিরুদ্ধে রায় দেয়। দুর্নীতি, বিচার বিভাগের অদক্ষতা, বিচারকদের বিরুদ্ধে সহিংসতা এবং বিপুল সংখ্যক পুঞ্জিভূত মামলা একটি গুরুতর সমস্যা।

উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, ১৫ই নভেম্বর একটি অপটু আত্মঘাতী হামলায় দুজন বিচারক নিহত হয়। দুই সপ্তাহ পর চার জন আত্মঘাতী হামলাকারী চট্টগ্রামে একটি আদালতে দুজন পুলিশকে এবং গাজীপুরে একটি আদালতের অভ্যন্তরে কয়েকজন আইনজীবীকে হত্যা করে। ১লা ডিসেম্বর অজ্ঞাত হামলাকারীরা গাজীপুরে পৌর কমপ্লেক্সে হামলা চালায়। স্থানীয় আদালত এই কমপ্লেক্সেই অবস্থিত। কোন গ্রুপ এই সব হামলার দায়িত্ব স্বীকার না করলেও হামলার স্থানগুলোতে জেএমবির লিফলেট পাওয়া যায়। বিচারকরা উন্নতর নিরাপত্তার দাবীতে ডিসেম্বরে ধর্মঘট করে।

আদালত ব্যবস্থায় দুটি স্তর রয়েছে নিম্ন আদালত এবং সুপ্রীম কোর্ট। উভয় আদালতে ফৌজদারি ও দেওয়ানি মামলার শুনানী হয়। নিম্ন আদালত ম্যাজিস্ট্রেট এবং সেশন ও জজ দ্বারা পরিচালিত। ম্যাজিস্ট্রেটরা নির্বাহী শাখার অংশ। শেশন ও জেলা জজ বিচার শাখার অংশ। সুপ্রীম কোর্ট -- হাইকোর্ট ও আপিল বিভাগ এই দুই ভাগে বিভক্ত। হাইকোর্টে প্রধানত সংবিধান বিষয়ক মামলাগুলোর শুনানী এবং নিম্ন আদালতগুলো থেকে আসা মামলাগুলোর শুনানী হয়ে থাকে। হাইকোর্টের রায়, ডিক্রি, আদেশ বা দণ্ডের শুনানীর এক্তিয়ার আপিল আদালতের। সকল আদালত কর্তৃক আপিল আদালতের রুলিং পালন বাধ্যতামুলক।

বিচার বিভাগকে নির্বাহী শাখা থেকে পৃথক করার জন্য সুপ্রীম কোর্টের আদেশ পালন সরকার বিলম্বিত করে চলেছে। সুপ্রীম কোর্ট এপ্রিলে সরকারকে তার আদেশ পালনের চূড়ান্ত সময় ২০শে অক্টোবর নির্ধারণ করে সময়সীমা ২০তম বারের মতো বৃদ্ধি করে। ২০শে অক্টোবর সরকারের ২১তম বারের মতো

সময়সীমা বৃদ্ধির আবেদন প্রত্যাখ্যান করে। যাহোক, বছরের শেষ নাগাদ বিচার বিভাগ নির্বাহী শাখা থেকে পৃথক হয়নি।

সেপ্টেম্বরে হাইকোর্ট সংবিধানের একটি সংশোধনীকে অসাংবিধানিক বলে রায় দেয়। ঐ সংশোধনীতে ১৯৮০-এর দশকে জারি সামরিক আইনকে বৈধতা দেয়া হয়েছিল। সংগে সংগে প্রধানমন্ত্রীর দফতর প্রধানমন্ত্রীর প্রয়াত স্বামী সাবেক প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানের আমলের ওপর এই রায়ের সম্ভাব্য প্রতিক্রিয়া বিবেচনা করে তা স্থগিত করার জন্য দ্রুত ব্যবস্থা নেয়।

বিচার প্রক্রিয়া

আইনে অভিযুক্ত ব্যক্তিকে তার পক্ষে আইনজীবী নিয়োগ, তার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগের আলামত পরীক্ষা করার, সাক্ষী তলব করা এবং রায়ের বিরুদ্ধে আপিল করার সুযোগ রয়েছে। জুরি ছাড়াই বিচারকরা বিচার কার্য সম্পাদন করেন। বিচার কার্য সম্পাদিত হয় প্রকাশ্যে এবং বিবাদীদের তাদের পক্ষে আইনজীবী নিয়োগের অধিকার রয়েছে। যাহোক, রাষ্ট্রীয় অর্থে আইনজীবী নিয়োগ কারা হয় কদাচিৎ। আইন শৃঙ্খলা ভঙ্গ জনিত অপরাধ সংক্রান্ত দ্রুত বিচার আইন (এসটিএ) এবং নারী ও শিশু নির্যাতন প্রতিরোধ সংক্রান্ত আইনের অধীনে বিশেষ ট্রাইবুনালে মামলার শুনানী ও রায় দেয়া হয়। এই সব আইনে মামলাগুলোর তদন্ত ও বিচার একটি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে শেষ করতে হয়, অবশ্য নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে তা শেষ না হলে মামলাগুলো কিভাবে নিষ্পত্তি করা হবে, তা আইনে স্পষ্ট করে বলা হয়নি। বিবাদীদের নির্দোষ বলে ধরে নেয়া হয়। তাদের আপিল করার অধিকার রয়েছে এবং সরকারী পক্ষের হাতে প্রমাণাদি পরীক্ষা করে দেখার সুযোগ রয়েছে।

আদালত ব্যবস্থা দুর্নীতিগ্রস্থ এবং বিপুল সংখ্যক মামলা পুঞ্জিভূত রয়েচে। বিচার কার্য দীর্ঘ সময় ধরে চলে এবং অভিযুক্ত ব্যক্তি আটক থাকে কারাগারে। এই সব অবস্থা অনেক লোককে ন্যায় বিচার থেকে বঞ্চিত করে। ২০০৪ সালের সেপ্টেম্বরে ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনালের একটি জরিপে দেখে যায় যে এসটিএ'র অধীনে দায়েরকৃত মামলার ৬৭ শতাংশ ক্ষেত্রে ম্যাজিস্ট্রেট, আইনজীবী ও আদালতের কর্মকর্তারা বিবাদীদের কাছ থেকে ঘুষ চেয়েছে (অনুচ্ছেদ ১ ঘ দ্রষ্টব্য)।

২০০৪ সালের জুলাইতে সংসদ অলটারনেটিভ ডিসপুট রেজুলিউশন (এডিআর)কে আইনসিদ্ধ করে এবং এর ব্যবহার সিলেট ও চট্টগ্রামে সম্প্রসারিত করে। এডিআর-এর আওতায় নাগরিকরা মধ্যস্থতার আবেদন করার আগে নিজেরাই তাদের মামলা উপস্থাপন করতে পারেন। সরকারী সুত্রে জানা যায় দেওয়ানি মামলাগুলোতে মধ্যস্থতার ব্যাপক ব্যবহার বিচারকে দ্রুততর করেছে। এডিআর ব্যবস্থার জনপ্রিয়তা থাকলেও এই ব্যবস্থার ন্যায্যতা বা নিরপেক্ষেতা সম্পর্কে কোন স্বতন্ত্র সংস্থা মুল্যায়ন করেনি। মুসলিম পারিবারিক অধ্যাদেশ উত্তরাধিকার, বিবাহ ও মুসলিম সম্প্রদায়ের সদস্যদের রেজিস্ট্রিকৃত বিবাহের বিচ্ছেদ সম্পর্কে সনাতনী ইসলামি আইনকে আইনসিদ্ধ করেছে। হিন্দু ও খ্রীস্টান সম্প্রদায়ের জন্য অনুরূপ পৃথক আইন রয়েছে। আইন সম্পর্কে অজ্ঞতার কারণে গ্রামাঞ্চলে বিবাহ কখনো কখনো রেজিস্ট্রি করা হয় না।

রাজনৈতিক বন্দী

সরকার জানায় যে তাদের হাতে কোন রাজনৈতিক বন্দী নেই। বিরোধী দল ও মানবাধিকার পর্যবেক্ষকরা অবশ্য দাবী করে যে সরকার অনেক রাজনৈতিক কর্মীকে আটক করে ভিত্তিহীন ফৌজদারি

অভিযোগে শাস্তি দিয়েছে। (অনুচ্ছেদ ১ ঘ দ্রষ্টব্য) এনজিওদের বন্দীদের সাথে সাক্ষাৎ করার কোন সুযোগ নেই।

৩০শে এপিল ঢাকার একটি আদালত সালাহ উদ্দীন শোয়েব চৌধুরিকে জামিনে মুক্তি দেয়। ইসরাইলে যাওয়ার প্রচেষ্টার জন্য ২০০৩ সালে তাকে বিমানবন্দর থেকে আটক করা হয়।

সম্পত্তি প্রত্যর্পণ

আলোচ্য বছরে সরকার হিন্দুদের সম্পত্তি ফিরিয়ে দেয়ার উদ্দেশ্যে ২০০১ সালের অর্পিত সম্পত্তি (প্রত্যর্পণ) আইন বাস্তবায়নের জন্য কোন কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করেনি। ১৯৬৫ সালের ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধের পর সরকার অর্পিত সম্পত্তি আইনের অধীনে এদের সম্পত্তি অধিগ্রহণ করে। সরকার তার নিয়ন্ত্রণে অর্পিত সম্পত্তির তালিকা প্রকাশ করেনি। ফলে মুল জমির মালিকরা তাদের সম্পত্তি দাবী করতে পারছেনা (অনুচ্ছেদ ২ গ দ্রষ্টব্য)।

চ. গোপনীয়তা, পরিবার, বাড়ি বা চিঠিপত্রের ওপর স্বেচ্ছামুলক হস্তক্ষেপ

আইনে গোয়েন্দা ও আইন রক্ষাকারী সংস্থাগুলোকে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের প্রধান নির্বাহীর কাছ থেকে অনুমতি নিয়ে টেলিফোনে আড়ি পাতার সুযোগ দেয়া হয়েছে। অধ্যাদেশটি সরকারকে রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তার স্বার্থে ফোন পরিচালনাকারী প্রতিষ্ঠানগুলোর বার্তা আদান প্রদান করতে বাধা দেয়ার কর্তৃত্ব দেয়া হয়েছে। জাতীয় জরুরী অবস্থায় সরকার যোগাযোগ সার্ভিস প্রদানকারীকে ক্ষতিপূরণ না দিয়ে তার লাইসেন্স বাতিল করতে পারে। অধ্যাদেশটি সংসদ অধিবেশনের বিরতি কালে কার্যকর হলেও সংসদের অধিবেশন বসলে তাকে আইনে পরিণত করতে হবে।

এসপিএ'র সংগে সংশ্লিষ্ট নয় এমন মামলাগুলোতেও পুলিশ কদাচিৎ ওয়ারেন্ট সংগ্রহ করে থাকে। এই প্রক্রিয়া ভঙ্গকারী অফিসারদের শাস্তি দেয়া হয় না। আরএসএফ দাবী করে যে পুলিশ সাংবাদিকদের ই-মেইলের ওপর নজর রাখে। পুলিশের স্পেশাল ব্রাঞ্চ, ন্যাশনাল সিকিউরিটি ইনটিলিজ্যান্স, ডাইরেক্টরেট জেনারেল অব ফোর্সেস ইনটিলিজ্যান্স সরকারের রাজনৈতিক বিরোধী বলে অনুমিত ব্যক্তিদের নজর রাখার জন্য চর নিয়োগ করে।

সরকার মাঝে মধ্যে লোকজনকে জোর করে পুনর্বাসিত করে। মে ও জুন মাসে সরকার একটি উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়নের উদ্দেশ্যে দিনাজপুরের একটি এলাকা থেকে প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে বসবাসরত আনুমানিক ৩৫টি পরিবারকে উচ্ছেদ করে। এই প্রকল্পের অর্থ প্রত্যাহার করা হলে পরিবারগুলোতে তাদের জায়গায় ফেরার অনুমতি দেয়া হয়। কিন্তু সরকার তাদের ঘরবাড়ির ক্ষয়ক্ষতির জন্য কোন ক্ষতিপূরণ দেয়ার উদ্যোগ নেয় নি। ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলো তাদের ঘরবাড়ি পুনর্নির্মান না করার আগে অস্থায়ীভাবে ঘর তৈরি করে বরবাস করছে। ২০০৪ সালের নভেম্বরে সরকার ঢাকার আগারগাঁওয়ে একটি বস্তি উচ্ছেদ করে।

একটি স্থানীয় এনজিও এই উচ্ছেদের বিরুদ্ধে রিট দায়ের করলে সরকার জানায় যে এই বস্তিটি আসন্ন দক্ষিণ এশীয় আঞ্চলিক সহযোগিতা সংস্থার শীর্ষ সম্মেলনের নিরাপত্তার প্রতি হুমকিস্বরূপ। সরকার জানায় যে তারা এই অস্থায়ী বাসস্থানের জায়গায় দোকান অন্যান্য ব্যবসা প্রতিষ্ঠান স্থাপন করবে।

পুলিশ যাদের খুঁজছে, তাদের পরিবারগুলোকে পুলিশ কখনো কখনো হুমকি দিয়ে দিয়ে থাকে। আলোচ্য বছরে এমন পরিবারগুলোর কাছ থেকে ফেরারীদের সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহের উদ্দেশ্যে তাদের ওপর শারীরিক নির্যাতন বা আটকের কয়েকটি ঘটনা ঘটেছে।

অনুচ্ছেদ ২. নাগরিক স্বাধীনতার প্রতি সম্মান প্রদর্শন

ক. বাক ও সংবাদপত্রের স্বাধীনতা

দেশের প্রচলিত আইনে বাক স্বাধীনতা এবং সংবাদপত্রের স্বাধীনতার বিধান রয়েছে। তবে বাস্তবিক ক্ষেত্রে সরকার এই সব অধিকারকে সীমিত করেছে।

একজন নাগরিক প্রকাশ্যে সরকারের সমালোচনা করলে তার ওপর প্রতিশোধ গ্রহণের আশঙ্কা রয়েছে। রাজনৈতিক সমাবেশ করতে বাধা দিয়ে অথবা তা পন্ড করে দিয়ে সরকার তার কর্মকান্ডের বিরুদ্ধে সমালোচনা বন্ধ করার চেষ্টা করেছে।

শত শত দৈনিক ও সাপ্তাহিক পত্রিকা বিভিন্ন ধরনের মতামত প্রকাশের বাহন হিসেবে কাজ করেছে। অধিকাংশ সংবাদপত্র প্রধানমন্ত্রীসহ সরকারের নীতি ও কর্মকান্ডের সমালোচনা করে। সরকারী মালিকানাধীন একটি সংবাদ সংস্থা ছাড়াও ইউনাইটেড নিউজ অব বাংলাদেশ (ইউএনবি) নামে একটি বেসরকারী সংবাদ সংস্থা রয়েছে যার সাথে ফরাসী সংবাদ সংস্থা (এএফপি)-এর সাথে সংবাদ আদান প্রদানের ব্যবস্থা রয়েছে।

সংবাদপত্রের মালিকানা ও বিষয়বস্তু সরাসরি সরকারী বিধিনিষেধের আওতাধীন নয়। সরকার একটি বেতার কেন্দ্র ও একটি টেলিভিশন কেন্দ্রের মালিক এবং বেতার কেন্দ্র ও গুটি কয়েক টেলিভিশন কেন্দ্রকে সরকার বেশ কিছুটা প্রভাবিত করেছে। তবে বিগত বছরগুলোর মত আলোচ্য বছরে এই সব টেলিভিশন কেন্দ্র তাদের প্রচারে সরকারী কর্মকান্ডকে প্রাধাণ্য দেয়নি।

আলোচ্য বছরে চারটি বেসরকারী টেলিভিশন কেন্দ্র চালু ছিল, এবং মে মাসে সরকার আপাতদৃষ্টিতে নিয়মিত ভাড়া প্রদান করতে ব্যর্থ হওয়ায় একটি বেসরকারী বেতার কেন্দ্র বন্ধ করে দিয়েছে। সরকার বেসরকারী খাতে চারটি নতুন টেলিভিশন কেন্দ্র এবং তিনটি বেতার কেন্দ্র স্থাপনের লাইসেন্স প্রদান করেছে। অভিযোগ রয়েছে যে, সরকারের সাথে ঘনিষ্ঠ রাজনৈতিক সম্পর্ক রয়েছে এমন সব ব্যক্তিকে এই সব লাইসেন্স প্রদান করা হয়েছে। কেবল অপারেটররা (ডিশ কোম্পানী) সাধারণভাবে সরকারের কোন রকম হস্তক্ষেপ ছাড়াই তাদের কার্যক্রম চালিয়ে গেছে। তবে সকল বেসরকারি টেলিভিশন কেন্দ্রকে বিনা ভাড়ায় রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রীর ভাষণসহ কিছু সরকারি কার্যক্রম প্রচার করার শর্ত রয়েছে।

আলোচ্য বছরে সরকার, রাজনৈতিক দলগুলোর কর্মী, এবং অন্যান্যদের দ্বারা সাংবাদিক ও সংবাদপত্র অফিসগুলোতে প্রায়ই হামলা করা হয়েছে এবং তাদেরকে ভয়ভীতি প্রদর্শনের চেষ্টা করা হয়েছে। রাজনৈতিক সহিসংসতার সময় সাংবাদিকদের ওপর হামলা একটি সাধারণ ব্যাপার আর এই সব রাজনৈতিক সহিংসতার সময় গৃহীত পুলিশী পদক্ষেপে বেশ কিছু সংখ্যক সাংবাদিক আহত হয়েছে। একটি স্থানীয় মানবাধিকার সংগঠনের তথ্য অনুযায়ী আলোচ্য বছর ২ জন সাংবাদিক নিহত হয়েছে, ১৪২ জন আহত হয়েছে, ১১ জন গ্রেফতার হয়েছে, ৪ জনকে অপহরণ করা হয়েছে, ৫৩ জনকে মারধোর করা হয়েছে, এবং ২৪৯ জনকে হুমকি প্রদান করা হয়েছে।

উপরন্তু, আলোচ্য বছর অজ্ঞাত হামলাকারীরা জাতীয় সংবাদ সংস্থা "বাংলাদেশ সংবাদ সংস্থা" এবং চুয়াডাঙার দৈনিক মাথাভাঙ্গা-এর দপ্তরে হামলা চালায়। অনেক সম্পাদক এবং সাংবাদিক সরকারের বিরূদ্ধে নিবন্ধ লেখার জন্য বেনামী ফোন কল পেয়েছেন বলে অভিযোগ রয়েছে। তবে এসব ফোন কলে সহিংস হুমকির ইঙ্গিত খুবই কম ছিল । ২০০৪ সালে "রিপোর্টারস উইদাউট বর্ডারস (আরএসএফ)" বাংলাদেশে সাংবাদিকদের নিরাপত্তা ব্যবস্থা এবং তাদের প্রতি আচরণের সমালোচনা করে।

আরএসএফ-এর তথ্য অনুযায়ী ঢাকার উত্তরে গাজিপুরের একটি সরকারী ভবনে জেএমবি জঙ্গীরা বোমা বিস্ফোরণ ঘটায় যার ফলে তিন জন সাংবাদিক আহত হয়। ২১ নভেম্বর তারিখে আওয়ামী লীগের একটি বিক্ষোভ মিছিলের চিত্র গ্রহণের সময় পুলিশ চ্যানেল আই টেলিভিশনের প্রতিবেদক মাহবুব মতিনকে মারধোর করে। পুলিশ মাহবুব মতিনের ক্যামেরাম্যানকেও আহত করে।

২ মে তারিখে ইসরায়েল ভ্রমনের প্রচেষ্টা চালানোর অভিযোগে গ্রেফতারকৃত সাংবাদিক সালাহউদ্দিন শোয়েব চৌধুরীকে কর্তৃপক্ষ মুক্তি প্রদান করে।

খুলনা প্রেস ক্লাবের সভাপতি মানিক চন্দ্র সাহাকে ২০০৪ সালের জানুয়ারী মাসে হত্যা করা হয়। ২০০৪ সালের জুন মাসে দৈনিক জন্মভূমির সম্পাদককে হত্যা করা হয় এবং ২০০৪ সালে দৈনিক দুর্জয় বাংলার সম্পাদক দীপঙ্কর চক্রবর্তীকে হত্যা করা হয়। এসব হত্যাকান্ডের এখনও কোন সুরাহা হয়নি।

সরকার পরোক্ষভাবে সাংবাদিকদের ওপর স্বআরোপিত সেন্সরশিপ প্রয়োগ করতে বাধ্য করে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় যে, ২০০৪ সালের জুলাই মাসে প্রধানমন্ত্রীর দফতরের তথ্য শাখার একজন কর্মকর্তা একটি বেসরকারী টেলিভিশনের রিপোর্টারকে ক্ষমতাসীন দলের অনুষ্ঠানে প্রবেশের অধিকার কেড়ে নেয়ার হুমকি প্রদান করে যদি সেই রিপোর্টার একজন বিরোধী দলীয় প্রার্থীর নির্বাচনী প্রচারণায় অংশগ্রহণ করা থেকে বিরত না থাকে। এই হুমকি আমলে না নেয়ায় সংশ্লিষ্ট রিপোর্টারের উর্ধতন কর্মকর্তারা তাকে নির্বাচনী প্রচারণার কাজ থেকে প্রত্যাহার করে নেয়।

বিদেশী প্রকাশনা ও চলচ্চিত্র পর্যালোচনা ও সেন্সরশীপের আওতাধীন ছিলো। সরকারের ফিল্ম সেন্সর বোর্ড স্থানীয় ও বিদেশী ছায়াছবি পর্যালোচনা করে থাকে এবং রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তা, আইন শৃঙ্খলা, ধর্মীয় অনুভূতি, অশালীনতা, বৈদেশিক সম্পর্ক, চরিত্র হনন বা নকলের অভিযোগে যে কোন ছায়াছবি সেন্সর বা নিষিদ্ধ করতে পারে। ভিডিও লাইব্রেরীগুলো বিভিন্ন ধরনের ফিল্ম তাদের সদস্যদের ভাড়া দিয়ে থাকে আর এদের ক্ষেত্রে সরকারী সেন্সর আরোপের চেষ্টা মাঝে মাঝে হয়ে থাকে তবে তা ফলপ্রসূ হয় না।

অশালীন আলোকচিত্র, ইসলাম ধর্মের ভুল ব্যাখ্যা বা অবমাননাকর কোন কিছু লেখা থাকলে অথবা জাতীয় নেতৃবৃন্দ সম্পর্কে কোন আপত্তিকর মন্তব্য থাকলে প্রায়শই তাতে সেন্সরশীপ আরোপ করা হয়। "মাই আর্কিটেক্ট" চলচ্চিত্রের একটি বাক্য সরকার বাদ দিয়ে দেয় যে বাক্যে বাংলাদেশকে বিশ্বের দরিদ্রতম দেশ হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। এই ছবিটি অগাস্ট মাসে প্রদর্শিত হয়েছিল। ২০০৪ সালের ১৫ এপ্রিল সরকার ভারতীয় "দেশ" পত্রিকার ২ এপ্রিল সংখ্যায় আদম ও হাওয়া সম্পর্কে অশালীন মন্তব্য করায় "দেশ" পত্রিকার এই সংখ্যাটি নিষিদ্ধ করে। ২০০৪ সালের সরকার বাংলাদেশ সম্পর্কে নেতিবাচক চিত্র তুলে ধরার কারণে সরকারী দপ্তরসমুহ এবং বাংলাদেশের জাতীয় বিমান সংস্থার বিমানগুলোতে "টাইম" পত্রিকার বিতরণ নিষিদ্ধ করে।

লেখিকা তসলিমা নাসরিন ২০০৪ সালে মুচলেকা দিয়ে জামিনে মুক্তি লাভের পর বিদেশেই অবস্থান করছেন। দেশের মুসলিম সম্প্রদায়ের ধর্ম বিশ্বাসে আঘাত দেয়ার অভিযোগে তার বিরুদ্ধে ফৌজদারী অভিযোগ এখনও মুলতুবী রয়েছে (অনুচ্ছেদ ২গ দ্রষ্টব্য) । তার মামলাটির কোন অগ্রগতি হয়নি। সরকার বাংলাদেশী নাগরিকদের ইন্টারনেট ব্যবহারের ক্ষেত্রে সরাসরি কোন রকম বাধা সৃষ্টি করে না। তবে রিপোটার্স উইদাউট বর্ডারের পক্ষ থেকে দাবি করা হয় যে পুলিশ সাংবাদিকদের ই-মেইল মনিটর করে (অনুচ্ছেদ ১চ দ্রষ্টব্য)।

সরকার শিক্ষাঙ্গনের স্বাধীনতাকে সীমিত করেনি। তবে ধর্মীয় ও রাজনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে অত্যন্ত স্পর্শকাতর বিষয়ে গবেষণা নিরুৎসাহিত করা হয়।

খ. শান্তিপুর্ণ সভা সমাবেশ করা ও সংগঠন করার স্বাধীনতা

সংবিধানে জনশৃঙ্খলা ও জনস্বাস্থ্যের স্বার্থে বিধিনিষেধ সাপেক্ষে সভা সমাবেশ করার স্বাধীনতা রয়েছে। অবশ্য, সরকার প্রায়ই এই অধিকার সীমিত করে। আইনের আওতায় সরকার একত্রে চার জনের অধিক ব্যক্তির একত্র সমাবেশ নিষিদ্ধ করতে পারে। একটি স্থানীয় মানবাধিকার এনজিও আইন ও শালিশ কেন্দ্র -এর তথ্য অনুযায়ী আলোচ্য বছরের জানুয়ারী থেকে মধ্য আগস্ট পর্যন্ত সরকার ৭৩ বার এই নিষেধাজ্ঞা জারি করেছিল। সরকার কখনো কখনো নিরাপত্তার কারণে নিষেধাজ্ঞা জারি করে সভাসমাবেশ নিষিদ্ধ করে।

২৬শে ফেব্রুয়ারি ঢাকায় পুলিশ আওয়ামী লীগের যুব সংগঠন আওয়ামী যুব লীগের একটি মিছিল ছত্রভঙ্গ করার জন্য লাঠি চার্জ করে এবং কাঁদানে গ্যাস নিক্ষেপ করে। যুব লীগের কর্মীরা জঙ্গীবাদ, খাদ্য ও জ্বালানী তেলের মুল্য বৃদ্ধির প্রতিবাদ করছিল। পুলিশ যুব লীগের সাধারণ সম্পাদক এবং ৩০ জন কর্মীকে আহত করে এবং পুলিশের দু'জন অফিসারও এই ঘটনায় আহত হয়।

২ মার্চ পুলিশ এবং বিএনপি কর্মীরা আওয়ামী লীগ কর্মী ভর্তি বাসগুলোতে হামলা চালায়। আওয়ামী লীগের এসব কর্মী ঢাকার পল্টন ময়দানে আওয়ামী লীগের একটি সমাবেশে যোগদানের জন্য যাচ্ছিল। সংবাদপত্রের প্রতিবেদন অনুযায়ী এই হামলায় পুলিশ আওয়ামী লীগের ৫০ জন কর্মীকে আহত করে।

১ জুন বিএনপি কর্মীরা সভাস্থল ক্ষতিগ্রস্ত করে বিকল্প ধারা বাংলাদেশ (বিডিবি)-এর একটি সভা বানচাল করে দেয়। বিকল্প ধারা বাংলাদেশের প্রধান হচ্ছেন প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি বদরুদ্দোজা চৌধুরী।

২২ নভেম্বর বিএনপি কর্মী এবং পুলিশ আওয়ামী লীগের মহাবেশে যোগদাননের লক্ষ্যে সমাবেশ স্থলে যাওয়ার সময় আওয়ামী সমর্থকদের বিরুদ্ধে প্রতিবন্ধক সৃষ্টি করে। ঢাকার বাইরে থেকে এক ঘন্টার মধ্যে ঢাকায় আসা যায় এমন তিনটি স্থান থেকে আসা আওয়ামী সমর্থকদের ঢাকয় আগমনের সময় প্রতিবন্ধক সৃষ্টি করা হয়। যে সব স্থানে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করা হয় সেগুলো হচ্ছে ধামরাই, কেরানীগঞ্জ এবং মানিকগঞ্জ।

২০০৪ সালের জানুয়ারি মাসে টাঙ্গাইলের মধুপুরের জঙ্গালে বনের জমিতে ইকো পার্ক করার প্রতিবাদে একটি মিছিলে অংশ গ্রহনের সময় পুলিশ ও ফরেস্ট গার্ডদের গুলিতে গারো সম্প্রদায়ের সদস্য পিরেন সনাল নিহত হন। পিরেনের পরিবারের সদস্যদের আবেদনের প্রেক্ষিতে এই ঘটনার ব্যাপারে ম্যাজিস্টেটের আদালত বিচার বিভাগীয় তদন্ত করে। কিন্ত তথ্যের অপর্যাপ্ততার কারণে আদালত নভেম্বর মাসে মামলাটি খারিজ করে দেয় । ম্যাজিস্টেটের আদালতের তদন্ত রিপোর্টের বৈধতা চ্যালেঞ্জ করে পিরেনের পরিবারের পক্ষ থেকে আরেকটি পিটিশন দায়ের করা হয়। কিন্তু বছর শেষ হলেও বিষয়টি নিস্পত্তির অপেক্ষায় রয়েছে।

সমাবেশের স্বাধীনতা

সংবিধানে নৈতিকতা বা জনশৃঙ্খলার স্বার্থে "যুক্তিসঙ্গাত বিধিনিষেধ সাপেক্ষে" প্রতিটি নাগরিকের সমিতি গঠনের অধিকার দেয়া হয়েছে। সাধারণভাবে সরকার এই অধিকার মান্য করে। ব্যক্তি বিশেষ যে কোন বেসরকারী গ্রুপে যোগ দিতে পারে।

গ. ধর্মীয় স্বাধীনতা

সংবিধানে ইসলাম রাষ্ট্রীয় ধর্ম হিসেবে প্রতিষ্ঠিত থাকলেও আইন, জনশৃঙ্খলা ও নৈতিকতার সাপেক্ষে ব্যক্তি বিশেষের ইচ্ছা অনুযায়ী ধর্ম পালনের অধিকার রয়েছে। সরকার কার্যত এই অধিকারের প্রতি শ্রদ্ধাশীল। যদিও সরকার ধর্মনিরপেক্ষ তবুও রাজনীতিতে ধর্মের অত্যন্ত শক্তিশালী প্রভাব রয়েছে। সরকারী ও সামাজিক উভয় পর্যায়েই ধর্মীয় সংখ্যালঘু গোষ্ঠীর সদস্যরা বৈষম্যের শিকার হয়েছে। তবে সরকারী চাকুরী, রাজনৈতিক পদলাভ এবং ন্যায় বিচারের ক্ষেত্রে ধর্মীয় সংখ্যালঘুরা কার্যত কোন সুবিধা ভোগ করতে পারে না।

ধর্মীয় সংগঠনগুলোকে সরকারের কাছে নাম রেজিষ্ট্রি করতে হয় না। সামাজিক উন্নয়ন প্রকল্পের জন্য বিদেশ থেকে অর্থ গ্রহণ করলে সকল এনজিও এবং ধর্মীয় সংগঠনকে সরকারের এনজিও বিষয়ক ব্যুরোর কাছে তাদের নাম রেজিস্ট্রি করতে হয়। কোন এনজিও-এর রেজিস্ট্রেশন বাতিল, তার নির্বাহী কমিটি বিলুপ্ত করা, ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট আটক করা অথবা কোন প্রকল্প বাতিলসহ তার বিরুদ্ধে অন্য কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করার আইনগত ক্ষমতা সরকারের রয়েছে। এই ক্ষমতা অবশ্যি কদাচিৎ ব্যবহার করা হয় এবং ধর্মীয় সংশ্লিষ্টতা রয়েছে এমন এনজিওগুলো সরকারের এই ক্ষমতার ফলে ক্ষতিগ্রস্ত হয়নি।

আলোচ্য বছরেও আহমদীয়া সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে বৈষম্য অব্যাহত থাকে। আহমদীয়া সম্প্রদায়ের প্রকাশনা নিষিদ্ধ করে সরকারী আদেশকে হাই কোর্ট স্থগিত ঘোষণা করে এবং এই স্থগিতাদেশ এখনও বলবত রয়েছে। সরকার এই স্থগিতাদেশের বিরুদ্ধে অ্যাপিলেট আদালতে কোন আপিল দায়ের করেনি। ফলে এই

প্রথম বারের মত সরকার কার্যত কিছু সময়ের জন্য আহমদীয়া সম্প্রদায়ের প্রকাশনা অব্যাহত রাখে। সময়ে সময়ে পুলিশ বিক্ষোভকারীদের আহমদীয়া সম্প্রদায়ের মসজিদের "মসজিদ" লেখা চিহ্ন সমুহ উচ্ছেদ করতে দেয় এবং কখনো কখনো তাদের সহযোগিতা করে। ১৭ই এপ্রিল আন্তর্জাতিক খতমে নবুয়ত আন্দোলনের প্রায় ১৫০০০ কর্মী সাতক্ষীরায় একটি আহমদীয়া মসজিদের দিকে শোভাযাত্রা করে যায় এবং আহমদীয়াদের একটি মসজিদ থেকে "মসজিদ" লেখা সাইন বোর্ডটি অপসারণ করার চেষ্টা করে। আহমদীয়া সম্প্রদায়ের অনুসারীরা তাদেরকে থামানোর চেষ্টা করে কিন্তু শোভাযাত্রাকারীরা তাদের প্রতি ইট পাটকেল নিক্ষেপ করে। পুলিশ হস্তক্ষেপ করার চেষ্টা করে তবে আহমদীয়া বিরোধীদের বিরত না করে পুলিশ মসজিদের "মসজিদ" লেখা সাইন বোর্ডটি অপসারণে খতমে নবুয়তের সমর্থকদের সহায়তা করে।

আগের বছরের মতই সরকার আলোচ্য বছরেও অর্পিত সম্পত্তির তালিকা প্রকাশ করতে ব্যর্থ হয় ১৯৬৫ সালে ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধের পর হিন্দুদের সম্পত্তি সরকার অধিগ্রহণ করে।

বিদেশী মিশনারিরা দেশে কাজ করতে পারেন, তবে তাদের ধর্মান্তরকরণের অধিকার আইনে সংরক্ষিত নয়। কিছু মিশনারী ভিসা পেতে অথবা ভিসার নবায়ন করতে অসুবিধার সম্মুখীন হয় যা অবশ্যই বাৎসরিকভাবে নবায়ন করতে হয়। কিছু বিদেশী মিশনারী উল্লেখ করেছে যে অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা বাহিনী ও অন্যান্য সংস্থা তাদের কাজ খুব নিবিঢ়ভাবে পর্যবেক্ষণ করেছে। তবে কোন মিশনারীই আলোচ্য বছরে অন্য কোন ধরনের হয়রানীর কথা উল্লেখ করেনি। সরকার অন্যান্য বিভিন্ন ধর্মাবলম্বীদেরকে তাদের উপাসনালয় প্রতিষ্ঠা, তাদের যাজকদের প্রশিক্ষণ দান, ধর্মীয় উদ্দেশ্যে ভ্রমণ, এবং বিদেশে সমধর্মীয়দের সঙ্গে যোগাযোগ রাখার অনুমতি দেয়। আইনের আওতায় নাগরিকদের ধর্মান্তরকরণের সুযোগ রয়েছে। কিন্তু ইসলাম থেকে ধর্মান্তরকরণের ব্যাপারে জোর সামাজিক বিরোধিতা থাকায় অধিকাংশ খ্রীষ্টান মিশনারিদের লক্ষ্য হচ্ছে কয়েক প্রজন্ম ধরে যারা খ্রীষ্ট ধর্ম পালন করছে তাদের মাঝে তাদের তৎপরতা অব্যাহত রাখা।

সামাজিক নিগ্রহ এবং বৈষম্য

আলোচ্য বছরে আহমদীয়া, হিন্দু ও খৃস্টানদের বিরুদ্ধে নির্যাতন চলেছে। ২২শে জুন অজ্ঞাত পরিচয় ব্যক্তিরা নাটোরে একটি আহমদীয়া মসজিদে আগুন লাগিয়ে দেয় এবং দুই দিন পর অজ্ঞাত পরিচয় ব্যক্তিরা ব্রাহ্মনবাড়িয়ায় একটি আহমদীয়া মসজিদে কয়েকটি বোমা বিস্ফোরণ ঘটায় এবং ব্রাহ্মনবাড়িয়ার ভাদুগড়ে একটি আহমদীয়া মসজিদে চারটি বোমার বিস্ফোরণ ঘটায়। বছর শেষে এই সব বোমা হামলার সাথে সংশ্লিষ্টতার কারণে আট ব্যক্তিকে গ্রেফতার করা হয়।

২৮শে জুলাই অজ্ঞাত আততায়ীরা ফরিদপুরে অবস্থিত ত্রিশ্চিয়ান লাইফ বাংলাদেশ এনজিও-এর দু'জন কর্মচারীকে যীশু সম্পর্কিত একটি চলচ্চিত্র প্রদর্শনের অভিযোগে হত্যা করে। পুলিশ এই হত্যার দায়ে কয়েকজন সন্দেহভাজন ব্যক্তিকে গ্রেফতার করে তবে বছর শেষে পুলিশ সবাইকে মুক্তি প্রদান করে এবং তাদের বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ দাখিল করা হয়নি।

আহমদীয়া সম্প্রদায়কে অমুসলিম ঘোষণার জন্য খতমে নবুয়তের দাবি সরকার প্রত্যাখ্যান করার পর ২২শে ডিসেম্বর তারিখে খতমে নবুয়ত এবং একটি ছোট সংগঠনের কর্মীরা ঢাকায় আহমদীয়া কমপ্লেক্সে গিয়ে আহমদীয়া মসজিদ কোন মসজিদ নয় এমন একটি সাইন বোর্ড সেখানে স্থাপনের চেষ্টা করে। পুলিশ

তাদেরকে বাধা দেয় এবং থামিয়ে দেয়। পরবর্তীতে তাদের সাথে সংঘর্ষে ৫০ জন আহমদীয়া বিরোধী বিক্ষোভকারী এবং সাত জন পুলিশ আহত হয়।

পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত খবর অনুযায়ী ২০০৪ সালের জানুয়ারি মাসে স্থানীয় এক বিএনপি নেতার নেতৃত্বে সশস্ত্র হামলাকারীরা হিন্দুদের ২০ টি বাড়িতে আগুন লাগিয়ে দেয়া হলে ৩০ জন আহত হয়। আহতরা জানান জমিজমা নিয়ে বিরোধের জরে হিসেবে এই হামলা চালানো হয় ।

২০০৪ সালের সেপ্টেম্বর মাসে অজ্ঞাত বন্দুকধারীরা জামালপুর জেলায় নিজ বাসভবনের সামনে ধর্মান্তরিত খৃষ্টান ডাঃ জোসেফ গোমেজকে হত্যা করে। পুলিশ এই হত্যার সঙ্গে জড়িত থাকার অভিযোগে স্থানীয় মাদ্রাসা শিক্ষক মওলানা আব্দুস সোবহান মুন্সীকে গ্রেফতার করে দুই সপ্তাহ আটক রাখে কিন্ত পরে তাকে ছেড়ে দেয়া হয়। বছর শেষ হয়ে গেলেও এই হত্যা জন্য অন্য কারো বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ আনা হয়নি।

ধর্মীয় সংখ্যালঘু নাগরিকরা সরকারী চাকুরী ও রাজনৈতিক পদলাভের ক্ষেত্রে বৈষম্যের শিকার হয়। সরকারী চাকুরীর জন্য নিয়োগ কমিটিতে সাধারণত সংখ্যালঘু গোষ্ঠীর প্রতিনিধিদের রাখা হয় না। বাংলাদেশে ইহুদি সম্প্রদায়ের কোন সদস্য আছে বলে জানা নেই তবে সংবাদপত্রগুলোতে মাঝে মধ্যে ইহুদি-বিরোধী মন্তব্য প্রকাশিত হয়ে থাকে।

এ ব্যাপারে আরো বিস্তারিত তথ্যের জন্য ২০০৫ সালের 'আন্তর্জাতিক ধর্মীয় স্বাধীনতা প্রতিবেদন' দ্রষ্টব্য।

ঘ. দেশের অভ্যন্তরে চলাচলের, বিদেশ ভ্রমণের, এবং অভিবাসন ও প্রত্যাবাসনের অধিকার

দেশের অভ্যন্তরে অবাধ চলাচলের অধিকার, বিদেশে ভ্রমণ, অভিবাসন এবং প্রত্যাবাসনের অধিকার সংবিধান প্রদান করেছে। যদিও সরকার এই অধিকার প্রত্যাখান করেছে এমন নজিরও রয়েছে।

উদাহরণস্বরূপ বলা যায় যে, ২২শে জুন সরকারী কর্মকর্তারা দেশের উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের দিনাজপুর জেলায় ৩৫টি পরিবারের বসতভিটা ধবংস করে দেয়। ঐ জমিতে সরকারের একটি প্রকল্প বাস্তবায়ন করার কথা রয়েছে।

আইন অনুযায়ী কাউকে নির্বাসনে পাঠানো যায় না এবং সরকার সেটা করেনি।

ইসরায়েলে ভ্রমণের জন্য বাংলাদেশী পাসপোর্ট বৈধ নয়।

শরণার্থীদের সুরক্ষা

শরণার্থীদের মর্যাদা সম্পর্কিত ১৯৫১ সালের জাতিসংঘ কনভেনশন এবং ১৯৬৭ সালের সংশ্লিষ্ট প্রোটোকল অনুযায়ী কাউকে আশ্রয় অথবা শরণার্থীর মর্যাদা প্রদান বাংলাদেশের আইনে অন্তর্ভুক্ত নেই ।

সরকার শরণার্থীদের সুরক্ষার জন্য কোন পদ্ধতিও চালু করেনি। প্রকৃতপক্ষে সরকার শরণার্থী মর্যাদা লাভের অধিকারী ব্যক্তিদের জন্য কিছু আইনী সুরক্ষার ব্যবস্থা করেছে। এই ধরণের ব্যক্তি তাদের দেশে ফিরে গেলে নির্যাতনের সম্মুখীন হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। শরণার্থী বিষয়ক জাতিসংঘ হাইকমিশনার (ইউএনএইচসিআর)-এর সাথে কাজ করে সরকার কয়েক জন আশ্রয়প্রার্থীকে সাময়িক সুরক্ষা প্রদান করেছে। এসব ব্যক্তিদের ইউএনএইচসিআর সাক্ষাৎকার গ্রহণ করে তাদেরকে শরণার্থী হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছে। প্রত্যেক ব্যক্তিরই পৃথক পৃথক ভাবে সাক্ষাৎকার গ্রহণ করা হয় এবং তাদের আবেদন পৃথক পৃথক ভাবে বিবেচনা করা হয়।

আলোচ্য বছরে সরকার বর্মা থেকে আগত রোহিঙ্গাদের আশ্রয় প্রদান করতে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করে এবং তাদেরকে অবৈধ অর্থনৈতিক শরণার্থী হিসেবে বিবেচনা করে এবং যতজনকে সম্ভব সীমান্ত দিয়ে ফিরিয়ে দেয়। ইউএনএইচসিআর-এর মতে যেসব শরণার্থীকে সরকার ফিরিয়ে দেয় তাদের অনেকেই নির্যাতন এড়াবার জন্য এখানে এসেছিল এবং তারা শরণার্থীর মর্যাদা লাভের যোগ্য ছিল। ইউএনএইচসিআর শিবিরে অনিবন্ধিত কিছু ব্যক্তি তাদেরকে সরকারীভাবে প্রত্যাবাসন করার পরেও আবার অবৈধভাবে এখানে ফিরে আসে। তারা তাদের নিবন্ধিকৃত আত্মীয়স্বজনদের দেয় খাদ্য ও আশ্রয় ভাগ করে নেয়। বেশ কয়েক বার শরণার্থী শিবিরের কর্মকর্তারা অনিবন্ধিত ব্যক্তিদেরকে পুলিশের কাছে হস্তান্তর করে। পুলিশ তাদেরকে ফরেনার্স অ্যাক্টের আওতায় জেলে প্রেরণ করে। বছর শেষে কক্সবাজার জেলে ১১৪ জন রোহিঙ্গা বন্দী ছিল। ইউএনএইচসিআর-এর কর্মকর্তারা আটক শরণার্থীদের মাসে একবার করে জেলে দেখতে যায়।

শরণার্থীদের উপেক্ষা করার একটি ধারা অব্যাহত ছিল বিশেষ করে রোহিঙ্গা ও বিহারী শরণার্থীদের ক্ষেত্রে। আলোচ্য বছর ইউএনএইচসিআর-এর সহায়তায় সরকার পরিচালিত দুটি শিবিরে ২০,৯৩৯ জন রোহিঙ্গা শরণার্থী অবস্থান করে। আর ২০০,০০০ অবৈধ রোহিঙ্গা টেকনাফ ও কক্সবাজারের পার্শবর্তী এলাকায় অবস্থান করে। ইউএনএইচসিআর ও সরকার ৯২ জন রোহিঙ্গা শরণার্থীর প্রত্যাবাসনে একত্রে কাজ করে। ইউএনএইচসিআর বলপূর্বক প্রত্যাবাসনের সংখ্যা হ্রাস করতে সক্ষম হলেও তারা এই মর্মে অনেক অভিযোগ পেয়েছে যে, সরকারী শরণার্থী শিবিরের কর্মকর্তারা শরণার্থীদেরকে তাদের দেশে ফিরে যাওয়ার জন্য চাপ দিয়েছে, তাদেরকে গ্রেফতার, দৈহিক নির্যাতন এবং হয়রানির হুমকিও দিয়েছে।

ইউএনএইচসিআর-এর কর্মীরা শরণার্থী নির্যাতনের কিছু ঘটনার কথা জানিয়েছে। এগুলোর মধ্যে রয়েছে, ধর্ষণ, মারধোর, গৃহ কর্মে নিয়োজিত শরণার্থীদের নির্যাতন, রেশনে দেয় খাদ্যদ্রব্য থেকে বঞ্চিত করা, এবং নিবন্ধীকরণ সমস্যা। মার্চ মাসে ইউএনএইচসিআর এই মর্মে খবর পায় যে একজন পুলিশ ইন্সপেক্টর ও তার কর্মচারীরা ছয় জন মহিলাকে মারধোর করে এবং তাদেরকে ধর্ষনের চেষ্টা করে। এই সব মহিলা শরণার্থীর মধ্যে দুজন মেয়ের বয়স ছিল যথাক্রমে আট এবং ১২। ইউএনএইচসিআর এই ঘটনার বিরুদ্ধে শিবির কর্তৃপক্ষের কাছে তীব্র প্রতিবাদ জানায় তবে সরকার তাদের বিরুদ্ধে কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করেনি। ২০০৪ সালের ডিসেম্বর মাসে স্থানীয় গ্রামবাসীরা দুজন অপ্রাপ্তবয়স্ক মেয়ে শরণার্থীকে ধর্ষণ করে। সরকারী শরণার্থী শিবিরের কর্মকর্তারা শাস্তি হিসেবে আটক করা অথবা জেলে পাঠানোর বিকল্প হিসেবে শরণার্থীদেরকে প্রহার করাকেই অধিকতর ন্যায়সঙ্গাত বিবেচনা করে। শরণার্থী শিবিরে বিরোধ মধ্যস্থতা করার দায়িত্বে নিয়োজিত সরকারী কর্মকর্তারা শাস্থি হিসেবে শরণার্থীদের রেশন বই বাজেয়াপ্ত করে এবং এই রেশন বই ফেরত দেয়ার জন্য শরণার্থীদের কাছ থেকে ঘুষ আদায় করে। ইউএনএইচসিআর আলোচ্য বছরে সরকারী শরণার্থী ক্যাম্পগুলোতে রেশন বই বাজেয়াপ্ত করার শত শত অভিযোগ পেয়েছে।

সরকার শরণার্থীদের স্বাধীনভাবে চলাফেরা, কাজ করা অথবা জীবিকা অর্জনের কাজে নিয়োজিত হওয়ার ক্ষেত্রে অতিরিক্ত নিষেধাজ্ঞা আরোপ করে। বর্মায় ফিরে যেতে পারবে না এমন শরণার্থীদেরকে কাজ করতে দেয়ার অনুমোদন দান, স্বাস্থ্য সেবা সুবিধা প্রদান অথবা তাদের সন্তানদের স্কুলে পড়াশোনা করার সুযোগ দেয়ার জন্য ইউএনএইচসিআর সরকারের কাছে অনেক বার আবেদন করেছে তবে সরকার অব্যাহতভাবে সেইসব আবেদন উপেক্ষা করেছে। ইউএনএইচসিআর এই বলে আবেদন করে যে এই সব রোহিঙ্গা যতদিন তাদের দেশে ফিরে যেতে না পারে ততদিন তাদেরকে শরণার্থী শিবিরে থাকতে দেয়া হোক। সরকার দাবি করেছে যে রোহিঙ্গারা তাদের কাছে কোন টাকাকড়ি রাখতে পারবে না এবং তাদের কাছে কোন টাকা পাওয়া গেলে সেগুলো যে কোন সময়ে বাজেয়াপ্ত করা হবে।

২০০৪ সালের জুন মাসে সরকারের জোর করে দেশে ফেরত পাঠানো ও নিরাপত্তা বাহিনীর সদস্যদের দুর্ব্যবহারের প্রতিবাদে কুতুপালং শরনার্থী শিবিরে কিছু শরনার্থী বিক্ষোভ প্রদর্শন, রেশন প্রত্যাখান ও সরকার পরিচালিত স্বাস্থ্য সেবা ক্লিনিক বয়কট করে। ইউএনএইচসিআর এর মতে ২০০৪ সালের জুন মাসে কয়েক শত বিক্ষোভকারী পুলিশের নিয়মিত রাত্রিকালীন টহলের সময় তাদের উপর ইটপাটকেল নিক্ষেপ করলে পুলিশ কমপক্ষে ১৫ রাউন্ড গুলি বর্ষণ করে। হতাহতের কোন খবর পাওয়া যায়নি। ২০০৪ সালের নভেম্বর মাসে পুলিশ অস্ত্র চোরাচালানের সন্দেহে কমপক্ষে তিন জন রোহিঙ্গাকে হত্যা করে। তখন থেকে বেশ কয়েক জন শরণার্থীর কোন খোঁজ পাওয়া যাচ্ছে না। পুলিশ ইউএনএইচসিআর- এর কাছে এই মর্মে অঙ্গীকার করে যে তারা ঘটনাটি তদন্ত করবে, তবে বছর শেষ হয়ে এলেও তারা কোন তদন্ত করতে ব্যর্থ হয়। ইউএনএইচসিআর শরনার্থীদের অস্থায়ীভাবে অবস্থানের অধিকার এবং আত্মনির্ভর কর্মসূচির আওতায় চলাফেরা স্বাধীনতা প্রদানের প্রস্তাব দিলে সরকার বার বার তা প্রত্যাখান করে।

আনুমানিক ৩০০,০০০ বিহারী মুসলিম সারা দেশের বিভিন্ন শিবিরে বসবাস করছে। এরা সবাই অবাঙ্গালী মুসলমান, যারা ১৯৪৭ সালে বৃটিশ ভারতের বিভক্তির পর সাবেক পূর্ব পাকিস্তানে অভিবাসী হয়ে আসে। এদের অধিকাংশ ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে পাকিস্তানকে সমর্থন করে। রেফিউজিস ইন্টারন্যাশনাল-এর তথ্য অনুযায়ী তারা যে সব শিবিরে বাস করে সেখানে শিক্ষা ও চিকিৎসা সেবার খুব কমই ব্যবস্থা রয়েছে। তারা অত্যন্ত অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে বাস করছে। ১৯৭২ সালে কিছু বিহারী এ দেশের নাগরিকত্ব গ্রহণে অস্বীকৃতি জানায় এবং পাকিস্তানে প্রত্যাবাসনের জন্য অপেক্ষা করতে থাকে। তবে পাকিস্তান সরকার তাদেরকে গ্রহণ করতে অনিচ্ছুক। ১৯৭১ সালে জন্মগ্রহণকারী আটকে পড়া অনেক বিহারী বাংলাভাষী মুল জনগোষ্ঠির সাথে মিশে গেছে এবং তাদেরকে নাগরিকত্ব দেয়া হলে সম্ভবত তারা সেটা গ্রহণ করবে।

অনুচ্ছেদ ৩

রাজনৈতিক অধিকারের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ: সরকার পরিবর্তনের নাগরিক অধিকার

দেশের সংবিধান নাগরিকদের শান্তিপূর্ণভাবে সরকার পরিবর্তনের অধিকার দিয়েছে এবং সার্বজনীন ভোটাধিকার প্রয়োগের মাধ্যমে সময়ান্তরে অবাধ ও শান্তি পূর্ণভাবে নির্বাচন অনুষ্ঠানের মাধ্যমে নাগরিকরা এই অধিকার প্রয়োগ করে থাকে। যদিও এই সব নির্বাচনে সহিংসতার অনেক ঘটনা ঘটে থাকে।

সংসদ সদস্যবৃন্দ কমপক্ষে প্রতি পাঁচ বছর অন্তর সদস্য নির্বাচিত হয়ে থাকেন। সংসদে ৩৪৫ জন সদস্য রয়েছেন। এদের মধ্যে ৩০০ সরাসরি নির্বাচনের মাধ্যমে নির্বাচিত হয়ে থাকেন। বাকি ৪৫ জন মহিলা সদস্য বিভিন্ন রাজনৈতিক দল কর্তৃক মনোনীত হয়ে সংসদ সদস্যদের ভোটের মাধ্যমে অপ্রত্যক্ষভাবে নির্বাচিত হন। নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতার জন্য রাজনৈতিক দলের নেতারা প্রার্থী নিয়োগ করে থাকেন। অনেকেই অভিযোগ করে থাকে যে কিছুসংখ্যক প্রার্থী নির্বাচনী প্রচারণার জন্য প্রচুর পরিমাণে চাঁদা দিয়ে বা ব্যক্তিগত "উপহার" প্রদান করে পার্টি নেতাদের কাছ থেকে মনোনয়ন "ক্রয়" করে থাকে।

নির্বাচন এবং রাজনৈতিক অংশগ্রহণ

বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলের (বিএনপি) নেতা বেগম খালেদা জিয়া ২০০১ সালের সাধারণ নির্বাচনের মাধ্যমে দেশের প্রধানমন্ত্রী নির্বাচিত হন। এই নির্বাচনটিকে দেশী ও আন্তর্জাতিক পর্যবেক্ষকবৃন্দ সাধারণভাবে অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচন হিসেবে অভিহিত করেছেন। নির্দলীয় নিরপেক্ষ তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে অনুষ্ঠিত ২০০১ জাতীয় নির্বাচনে কিছু বিচ্ছিন্ন সহিংসতা এবং অনিয়মের ঘটনা ঘটে। জামায়াতে ইসলামী , বাংলাদেশ জাতীয় পার্টি ও ইসলামী ঐক্যজোট নিয়ে বিএনপি একটি চারদলীয় কোয়ালিশন সরকার গঠন করে। তবে দু'টি প্রধান দল বিএনপি ও আওয়ামী লীগই মুলত রাজনৈতিক দৃশ্যপটকে নিয়ন্ত্রণ করে।

২০০৪ সালের জুন মাসে আওয়ামী লীগ প্রায় এক বছর বর্জনের পর সংসদে ফিরে আসে এবং সেপ্টেম্বর মাসে ক্ষমতাসীন দলের প্রতি স্পীকারের পক্ষপাতিত্বের প্রতিবাদে আবার পার্লামেন্ট বর্জন করে। ফেব্রুয়ারি মাসে আওয়ামী লীগ সংসদ সদস্যবৃন্দ ভূতপূর্ব অর্থমন্ত্রী ও সংসদ সদস্য শাহ এ.এম.এস. কিবরিয়ার (অনুচ্ছেদ ১ ক দ্রষ্টব্য) হত্যাকান্ডের প্রতিবাদ করার উদ্দেশ্যে কয়েক মিনিটের জন্য সংসদের একটি অধিবেশনে যোগদান করেন। পুরো বছরই আওয়ামী লীগ দলীয় সংসদ সদস্যবৃন্দ বিভিন্ন মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় কমিটির সভায় যোগদান করেন। তবে তারা সংসদের অধিবেশন বর্জন অব্যাহত রাখেন এবং উপনির্বাচনে অংশগ্রহণ করা থেকেও বিরত থাকেন। আওয়ামী লীগ নেতারা তাদের রাজনৈতিক কর্মকান্ডে সরকারী নিষেধাজ্ঞা ও হস্তক্ষেপের অভিযোগ করেন (অনুচ্ছেদ ২.খ দ্রষ্টব্য)।

সংসদে জনগণের প্রত্যক্ষ ভোটে নির্বাচিত ৭ জন মহিলা সংসদ সদস্য রয়েছেন। সেপ্টেম্বর মাসে রাজনৈতিক দলগুলো ৪৫ জন মহিলা সদস্য মনোনয়ন দেন যারা মহিলাদের জন্য সংরক্ষিত আসনগুলো পূরণ করেন। ১৪তম শাসনতান্ত্রিক সংশোধনীর মাধ্যমে মহিলাদের জন্য এই ৪৫টি আসন সৃষ্টি করা হয়। এই সংশোধনী ২০০৪ সালের মে মাসে সংসদে অনুমোদিত হয়। এই মহিলা আসনগুলো সংসদে প্রতিনিধিত্বকারী রাজনৈতিক দলগুলোর আসন সংখ্যার অনুপাতে তাদের মধ্যে বরাদ্দ করা হয়। মহিলাদের জন্য ৪৫টি আসন সংরক্ষণের বিতর্কে আওয়ামী লীগ অংশ গ্রহণ করেনি এবং আওয়ামী লীগের জন্য বরাদ্দ আসনগুলো গ্রহণ করেনি। আওয়ামী লীগের যুক্তি ছিল এই সংশোধনী মহিলাদের প্রত্যক্ষ নির্বাচনের মাধ্যমে নির্বাচিত হওয়ার ব্যাপারে প্রদও অঙ্গীকারের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ নয়। একই যুক্তিতে কয়েকটি নারী অধিকার সংগঠন সংশ্লিষ্ট শাসনতান্ত্রিক সংশোধনীর প্রতিবাদ করে এবং এর বৈধতা চ্যালেঞ্জ করে আদালতের শরণাপন্ন হয়। সুপ্রিম কোর্ট তাদের আবেদন নাকচ করে দেন।

প্রধান মন্ত্রী সহ তিন জন মহিলা মন্ত্রীত্বের পদে আসীন। পার্লামেন্টে বিরোধী দলের নেতাও একজন মহিলা যার পদ মর্যাদা এক জন ক্যাবিনেট সদস্যের সমান। সুপ্রিম কোর্টের ৭৯ জন বিচারকের মধ্যে চার জন মহিলা।

সংখ্যালঘুদের জন্য সংসদীয় আসন সংরক্ষণের কোন ব্যবস্থা নেই। মোট জনসংখ্যার ১২ শতাংশ হচ্ছে সংখ্যালঘু তবে তারা তিন শতাংশেরও কম সংসদীয় আসনে নির্বাচিত হয়েছেন।

সরকার দুর্নীতি এবং স্বচ্ছতা

সরকারের মধ্যে দুর্নীতি এখনও একটি সমস্যা রয়ে গেছে। সেপ্টেম্বর মাসে প্রকাশিত ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল (টিআইবি) এই আভাস দেয় যে সরকারের সকল স্তরে বিরাজমান দুর্নীতি সুশাসন প্রতিষ্ঠা ও তা বিকাশের পথে একটি বিরাট চ্যালেঞ্জ হয়ে আছে। টিআইবি-এর একটি নমুনা জরিপে দেখা গেছে যে, দুর্নীতির অধিকাংশ ঘটনা পুলিশের সাথে সংশ্লিষ্ট। পক্ষান্তরে, অর্থ সংক্রান্ত দুর্নীতির ক্ষেত্রে টাকার অঙ্কে শীর্ষে রয়েছে যোগাযোগ মন্ত্রণালয়। ২০০৪ সালের একটি অনুরূপ জরিপে দেখা যায়, শতকরা ৯০ ভাগ লোক জমির মালিকানা পরিবর্তন রেজিস্ট্রেশনের সময় কর্মকর্তাদের ঘুষ দিয়ে থাকে। দ্রুত বিচার আইনের (এসটিএ) আওতায় দায়ের করা শতকরা ৬৭ ভাগ মামলায় ম্যাজিস্ট্রেট, আদালতের কর্মকর্তা ও আইনজীবীরা ঘুষ গ্রহন করে; চট্টগ্রাম বন্দরে বন্দর কর্তৃপক্ষ ও কাস্টমস কর্মকর্তারা আমদানী ও রপ্তানীকারকদের কাছ থেকে বছরে ১৩ কোটি ৩০ লাখ ডলার (প্রায় (৭৮৩ কোটি টাকা) ঘুষ আদায় করে থাকে। অফিসিয়াল সিক্রেটস এ্যাক্ট অব ১৯২৩ দুর্নীতিবাজ কর্মকর্তাদের জনগণের তথ্য যাচাই থেকে রক্ষা করে, এবং সর্বস্তরে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহীতা ব্যাহত করে।

নভেম্বর মাসে সরকার তিন সদস্যের দুর্নীতি দমন কমিশনর গঠনের ঘোষণা দেয়। এই কমিশন সাংগঠনিক সমস্যাগুলো নিয়েই ব্যস্ত থাকে এবং দুর্নীতি মোকাবিলায় কোন রকম ভূমিকা রাখতে ব্যর্থ হয়।

জনগণের সরকারি তথ্য সংগ্রহের সুবিধার জন্য কোন আইন নেই। অথচ অফিসিয়াল সিক্রেট এ্যাক্ট তথাকথিত জাতীয় নিরাপত্তার নামে দুর্নীতিবাজ কর্মকর্তাদের জনগনের তথ্য যাচাইয়ের হাত থেকে রক্ষা করে।

অনুচ্ছেদ ৪

মানবাধিকার লংঘনের কথিত অভিযোগ তদন্তের কাজে আন্তর্জাতিক ও বেসরকারী সংগঠনগুলোর প্রতি সরকারের দৃষ্টিভঙ্গি

বিভিন্ন ধরনের দেশী ও আন্তর্জাতিক মানবাধিকার সংস্থা সাধারনভাবে সরকারের বাধা ছাড়া স্বাধীনভাবে মানবাধিকার সম্পর্কিত বিভিন্ন বিষয় খতিয়ে দেখেছে এবং সেগুলো সম্পর্কে তদন্ত প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে। মানবাধিকার সংগঠনগুলো প্রায়ই সরকারের তীক্ষ্ণ সমালোচনা করলেও সংগঠনগুলো নিজেরাই রাজনৈতিকভাবে নাজুক মামলা ও বিষয়সমূহে স্ব-আরোপিত সেন্সরশীপ মেনে চলে। এর মধ্যে রয়েছে তাদের বিরুদ্ধে মিথ্যা মামলা দায়েরের মতো ঘটনা অথবা আন্তর্জাতিক মানবাধিকার কর্মীদের জন্য

'রিএন্ট্রি' ভিসা প্রদানে দীর্ঘ বিলম্ব। যেসব মিশনারি মানবাধিকারের সপক্ষে কাজ করেন, তারাও অনুরূপ সমস্যার সম্মুখীন হয়েছেন। কয়েকজন মানবাধিকার কর্মী জানিয়েছেন যে তারা গোয়েন্দা সংস্থার মাধ্যমে হয়রানির শিকার হয়েছেন। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, ২০০১ সালের সাধারণ নির্বাচনে প্রিপ ট্রাস্টের নির্বাহি পরিচালক অ্যারোমা দত্ত সংখ্যালঘুদের অধিকারের পক্ষে কাজ করায় সরকার সংস্থাটিকে বিদেশী সাহায্য ছাড়ের ওপর আংশিক নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছে।

ফেব্রুয়ারি মাসে উত্তরাঞ্চলে গ্রামীণ ব্যাঙ্ক ও ব্র্যাকসহ (বাংলাদেশ রুরাল অ্যাডভান্সমেন্ট কমিটি) কয়েকটি শীর্ষস্থানীয় এনজিও-এর অফিসে হামলা চালানো হয়। কর্তৃপক্ষ গ্রামীণ ব্যাঙ্ক ও ব্র্যাকসহ কয়েকটি সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে ও সংগঠনে ধারাবাহিক হামলা চালানোর জন্য আহলে হাদিস নেতা ডঃ আসাদুল্লাহ আল-গালিবকে অভিযুক্ত করে। ১লা মার্চ দিনাজপুরে কারিতাসের একটি অফিসে অগ্নিকান্ডের ঘটনা ঘটে। কিছু সংখ্যক সংবাদপত্রের প্রতিবেদনে বলা হয় দুটি বোমা বিস্ফোরণের কারণেই এই অগ্নিকান্ডের ঘটনা ঘটে।

১৯শে এপ্রিল নন-ভায়োলেন্স ইন্টারন্যাশনালের বাংলাদেশ শাখার প্রেসিডেন্ট রফিক আলি একটি অস্ত্র মামলা থেকে খালাস পান। কর্তৃপক্ষ অবৈধ অস্ত্র চোরাচালানের সন্দেহে তাকে গ্রেফতার করেছিল কারণ তিনি ফোরাম এশিয়ার সহযোগিতায় ক্ষুদ্র অস্ত্র চোরাচালান সম্পর্কিত শিক্ষামুলক সেমিনার আয়োজন করেছিলেন।

সরকার জাতিসংঘ মানবাধিকার কমিশন ও আই.সি.আর.সি'র মতো আন্তর্জাতিক সংগঠনগুলোর সাথে সহযোগিতা করে থাকে। আলোচ্য বছরে আই.সি.আর.সি বাংলাদেশ সফরে আসেনি। ২০০৪ সালের ডিসেম্বর মাসে জাতিসংঘ মানবাধিকার কমিশনের এশিয়া ও প্রশান্ত মহসাগরীয় অঞ্চলের পরিচালক রোহিঙ্গাদের অবস্থা দেখতে এদেশে আসেন। নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি এবং বহু বার জনসমক্ষে ঘোষণা দেওয়া সত্ত্বেও বাংলাদেশ সরকার একটি স্বাধীন জাতীয় মানবাধিকার কমিশন প্রতিষ্ঠার জন্য কোন আইন প্রণয়ন করেনি। একটি মানবাধিকার কমিশন প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে অনুমোদনকৃত ভূতপূর্ব আইনগুলো নিস্ক্রিয় রয়েই গেছে।

নারী

আলোচ্য সময়ে গৃহাভ্যন্তরীণ সহিংসতা ব্যাপকভাবে বিদ্যমান ছিল। যদিও মহিলাদের বিরুদ্ধে সংঘটিত সহিংস ঘটনার সংখ্যা নিরূপণ করা দুরূহ ছিল, তবে সাম্প্রতিক গবেষণায় দেখা গে ছে যে শতকরা ৫০ ভাগ মহিলাই গৃহাভ্যন্তরীণ সহিংসতার শিকার হয়েছে। এই সকল মহিলাদের বেশির ভাগই সহিংসতার শিকার হয়েছে যৌতুক সংক্রান্ত বিরোধের কারণে। অধিকার জানিয়েছে, আলোচ্য বছরে ২২৭ জন মহিলা যৌতুকের কারণে নিহত হয়েছে।

আইন অনুযায়ী ধর্ষণ ও স্বামী কর্তৃক স্ত্রীর ওপর দৈহিক নির্যাতন নিষিদ্ধ। তবে স্বামী কর্তৃক স্ত্রীকে ধর্ষণ অপরাধ হিসেবে গণ্য করার কোন সুনির্দিষ্ট বিধান নেই। স্থানীয় বেসরকারী সংস্থাগুলো আলোচ্য বছরে ৯০৭টি ধর্ষণের ঘটনা এবং ৯১টি ধর্ষণের প্রচেষ্টা রিপোর্ট করেছে। সংবাদপত্রগুলো থেকে জানা গেছে এসব ঘটনায় ১২৬ জনকে ধর্ষণের পর হত্যা করা হয়েছে এবং আরো ১৪ জন ধর্ষিতা আত্মহত্যা করেছে। মানবাধিকার পর্যবেক্ষণকারী সংস্থাগুলো জানিয়েছে যে প্রকৃত ধর্ষণের ঘটনা সংখ্যায় আরো কিন্তু অনেক

ঘটনারই কোন রিপোর্ট করা হয়নি। কারণ ধর্ষণের শিকার মেয়েরা সামাজিক কলঙ্কসহ ধর্ষণ পরবর্তী মানসিক নির্যাতনের যন্ত্রণা এড়াতে এই ব্যাপারে কোথাও কোন অভিযোগ করে না। ১৯শে জানুয়ারি তারিখে 'বিএসইএইচআর' আয়োজিত এক কর্মশালায় অ্যাটর্নি জেনারেল এ. এফ. হাসান আরিফ বলেন, "বিচারকরা ধর্ষণের ঘটনাকে যে কোন সাধারণ চুরি, ডাকাতি এবং অন্যান্য অপরাধের মতো করেই বিবেচনা করে।"

২০০৩ সালে ঢাকার মোহাম্মদপুর এলাকায় একটি পাঁচ বছরের মেয়েকে ধর্ষণ করার দায়ে ফেব্রুয়ারি মাসের ২ তারিখে ঢাকার একটি আদালত কালা গুড্ডু নামে এক ব্যক্তিকে ৩০ বছরের কারাদণ্ড দেয়।

পতিতাবৃত্তি আইনগতভাবে বৈধ এবং আলোচ্য বছরে এই সমস্যাটি অব্যাহত ছিল। বৈধভাবে পতিতাবৃত্তির বয়স ১৮ বছর হলেও বয়সের ব্যাপারে দেয়া মিথ্যা বিবৃতি সম্পর্কে সাধারণভাবে ভাবে কর্তৃপক্ষ উদাসীন। শিশুদের পতিতাবৃত্তিতে নিয়োজিত করার দায়ে খুব কমই বিচার হয়ে থাকে এবং পতিতালয়গুলোতে বিপুল পরিমাণ শিশু রয়েছে। ইউনিসেফের হিসেব অনুযায়ী ২০০৪ সালে বাংলাদেশে ১০ হাজার শিশু পতিতা ছিল তবে অন্যান্য হিসাব অনুযায়ী এই সংখ্যা ২৯ হাজার বলে ধারণা করা হয়। অভ্যন্তরীণ এবং আন্তর্জাতিক উভয় ক্ষেত্রেই নারী পাচার একটি সমস্যা হিসেবে বিরাজ করেছে (অনুচ্ছেদ ৫, পাচার দ্রষ্টব্য)।

আইনের আওতায় মহিলাদের বিরুদ্ধে কয়েক ধরনের বৈষম্য নিষিদ্ধ। নারী ও শিশু নির্যাতন প্রতিরোধ আইনে নারী ও শিশুদের বিরুদ্ধে সংঘটিত নির্যাতন এবং সহিংসতার অভিযোগ বিচারের উদ্দেশ্যে অভিযুক্ত ব্যক্তিদের জন্য বিশেষ নিয়মাবলী রয়েছে। আইনে কঠোর সাজা, নির্যাতিতদের ক্ষতিপূরণ দান, এবং কাজে অমনোযোগিতা অথবা ইচ্ছাকৃতভাবে কাজ না করার জন্য তদন্তকারী কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে শাস্তির বিধান রয়েছে। তবে এসব আইনের প্রয়োগ ছিল অত্যন্ত দুর্বল। ২০০৩ সালে প্রচলিত আইনের একটি সংশোধনী কার্যকর করা হয় যার আওতায় যৌতুক সংশ্লিষ্ট অপরাধের সাথে জড়িতদের শাস্তির বিধানগুলো এবং নারীদের "অসম্মানজনক" ঘটনার কারণে আত্মহত্যার কারণ উদঘাটনের বিধানগুলো দুর্বল হয়ে পড়ে।

সরকারী সূত্রগুলোর মতে, দুস্থদের জন্য সমাজ কল্যাণ মন্ত্রণালয় ছয়টি ভবঘুরে আশ্রয় কেন্দ্র এবং একটি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র পরিচালনা করে যেগুলোর মোট লোক ধারণ ক্ষমতা দুই হাজার তিনশ'। এছাড়াও, নির্যাতনের শিকার নারী ও শিশুদের জন্য মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় দেশের ছয়টি বিভাগীয় সদর দপ্তরের প্রতিটিতে একটি করে মোট ছয়টি আশ্রয় কেন্দ্র পরিচালনা করে। বাংলাদেশ জাতীয় মহিলা আইনজীবি সমিতি (বিএনডব্লিউএলএ)-র মতো কয়েকটি বেসরকারী সংস্থা দুস্থদের জন্য এবং দুস্থ নারী ও শিশুদের আশ্রয় দেয়ার জন্য হেফাজত কেন্দ্র পরিচালনা করে থাকে। তবে যারা নির্যাতনের শিকার তাদের সংখ্যার তুলনায় এই সব কেন্দ্রের সংখ্যা খুবই অপ্রতুল। এর ফলে সরকার ধর্ষণের অভিযোগকারী মহিলাদের "নিরাপত্তা হেফজতে" রাখে যার অধিকাংশই কারাগারগুলোতে অবস্থিত। নিরাপত্তা হেফাজতে রাখা নির্যাতিতরা অধিকাংশ সময়েই আরও নির্যাতনের শিকার হয়ে থাকে যার কারণে অন্যান্য মহিলারা তাদের বিরুদ্ধে সংঘটিত সহিংসতা সম্পর্কে অভিযোগ করতে নিরুৎসাহিত বোধ করে। অধিকাংশ ক্ষেত্রে দৈহিকভাবে নির্যাতিতা মহিলাদের দীর্ঘকাল যাবৎ নিরাপত্তা হেফাজতে রেখে দেয়া হয় এবং এ থেকে মুক্তি পাওয়া তাদের জন্যে দুরূহ হয়ে ওঠে (অনুচ্ছেদ ১.গ দ্রষ্টব্য)। ২০০৪ সালের সেপ্টেম্বর মাসে ১৮৪ জন মহিলা নিরাপত্তা হেফাজতে ছিল এবং তাদের সঙ্গে ৩২০টি শিশু ছিল।

পল্লী এলাকায় মাঝে মধ্যে বিচার বিভাগ বহির্ভূত গ্রাম্য সালিশের মাধ্যমে বিশেষ করে ধর্মীয় নেতা ও ফতোয়ার মাধ্যমে মহিলাদের শাস্তি দেয়ার ঘটনা ঘটেছে (অনুচ্ছেদ ১.গ দ্রষ্টব্য)। এসিড হামলা ক্রমশঃই একটি উদ্বেগজনক বিষয় হয়ে উঠেছে। হামলাকারীরা বহু সংখ্যক মহিলার মুখে এসিড ছুঁড়ে মেরেছে এবং এর শিকার পুরুষের সংখ্যাও আস্তে আস্তে বৃদ্ধি পাচ্ছে। এসিড নিক্ষেপের শিকারদের মুখাবয়ব বিকৃত হয়ে গিয়েছে এবং বেশির ভাগ সময় দেখা গেছে তারা দৃষ্টিশক্তিও হারিয়েছে। অধিকার-এর দেয়া তথ্য অনুযায়ী ২০০৫ সালে প্রায় ১৯৬ জন এসিড আক্রমণের শিকার হয়েছে। বেসরকারী সংস্থাগুলো জানায়, এসব আক্রমণের মধ্যে ১০৪টি মহিলাদের ওপর, ৫৫টি পুরুষদের ওপর এবং ৩৭টি শিশুর উপর এসিড হামলা চালানো হয়। এসিড হামলাকারীরা খুব কম ক্ষেত্রেই শাস্তি লাভ করেছে। ২০০২ সালে সরকার এসিডের সহজলভ্যতা নিয়ন্ত্রণ এবং মহিলাদের বিরুদ্ধে এসিড সহিংসতার ঘটনা হ্রাসের লক্ষ্যে আইন জারি করেছে। তবে এই আইন সম্পর্কে অজ্ঞতা এবং এই আইন যথাযথভাবে প্রয়োগ না হওয়ায় এর কার্যকারিতা সীমিতই রয়ে গেছে। 'এসিড অপরাধ নিয়ন্ত্রণ আইন ২০০২'-এর আওতায় অপরাধীকে দ্রুত বিচার ট্রাইবুনালে দ্রুততর বিচারের বিধান রয়েছে। এই আইনের আওতায় অভিযুক্তদের সাধারণত জামিন দেয়া হয় না। আলোচ্য বছরে স্পেশাল ট্রাইব্যুনাল যদিও পুরোপুরি কার্যকর ছিল না কিন্তু এসিড সার্ভাইভার্স ফাউন্ডেশনের মতে এ বছর এসিড নিক্ষেপের দায়ে ৩৬ জনকে সাজা দেয় হয়েছে।

অধিকাংশ ক্ষেত্রে সমাজে মহিলাদের স্থান গৌণ। সরকার তাদের মৌলিক স্বাধীনতা রক্ষার উদ্দেশ্যে তেমন কার্যকর কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করেনি (অনুচ্ছেদ ১.ঙ দ্রষ্টব্য)। বিগত দশকে পুরুষের তুলনায় মহিলাদের চাকুরীর অধিকতর সুযোগ সৃষ্টি হয়। এর কারণ হচ্ছে রপ্তানীমুখী পোশাক শিল্পের বিকাশ। পোশাক শিল্পে নিয়োজিত কর্মীদের ৮০ শতাংশই মহিলা। পল্লী অঞ্চলে সরকারি ও বেসরকারি উদ্যোগে বিপুল সংখ্যক মহিলার মধ্যে ক্ষুদ্র ঋণদান কর্মসূচী সম্প্রসারণ তাদের অর্থনৈতিক ক্ষমতার উন্নয়ন ঘটিয়েছে। এদেশে সাধারণত মহিলারা পুরুষদের অনুরূপ বেতন পেয়ে থাকে।

শিশু

সাধারণভাবে সরকার শিশু অধিকার ও কল্যাণের ব্যাপারে ইতিবাচক মনোভাব পোষণ করে। সরকারী উদ্যোগের সমর্থনে অনেক স্থানীয় ও বিদেশী এনজিও সম্পুরক কর্মসূচী গ্রহণ করে। এই সমস্ত যৌথ উদ্যোগের ফলে স্বাস্থ্য, পুষ্টি ও শিক্ষার উন্নয়নে এই দেশ তাৎপর্যপূর্ণ অগ্রগতি অর্জনে সমর্থ হয়েছে। তবে, অর্ধেকেরও বেশি শিশু দীর্ঘস্থায়ী অপুষ্টির শিকার।

আইন অনুযায়ী ছয় থেকে বারো বছর বয়সের শিশুদের স্কুলে যাওয়া এবং পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত পড়াশুনা করা বাধ্যতামুলক। প্রাথমিক শিক্ষা অবৈতনিক এবং বাধ্যতামুলক। বাবা-মায়েরা স্কুলে যাওয়ার বদলে তাদের ছেলেমেয়েদের অর্থ উপার্জনের মত কোন কাজে অথবা গৃহস্থালীর কাজে নিয়োজিত করায় বাধ্যতামুলক প্রাথমিক শিক্ষা পুরোপুরি বাস্তবায়ন হচ্ছে না। সরকার নানাভাবে পরিবারগুলোকে ছেলেমেয়েদের স্কুলে পাঠনোর জন্যে উৎসাহিত করায় সাম্প্রতিক বছরগুলোতে প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোতে ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা উল্লেখযোগ্য হারে বেড়েছে। ক্যামপেইন ফর পপুলার এডুকেশন-এর ২০০১ সালের পরিসংখ্যান অনুযায়ী আশি শতাংশ শিশু বিদ্যালয়ে ভর্তি হয়েছে। এদের মধ্যে বালক ও বালিকাদের সংখ্যা প্রায় সমান সমান। ক্যামপেইন ফর পপুলার এডুকেশন তাদের ২০০২ সালের এক প্রতিবেদনে জানিয়েছে প্রায় ৭০ শতাংশ শিশু পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত লেখাপড়া শেষ করেছে এবং ঝরে পড়া ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা শতকরা ২৪ দশমিক ৩ ভাগ। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের এক পরিসংখ্যান অনুযায়ী আলোচ্য বছরে স্কুল বয়সী শিশুদের মধ্যে ৯৭

শতাংশ শিশু প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তি হয়েছে। মেয়েদেরকে স্কুলে যাওয়ার জন্যে উৎসাহিত করার লক্ষ্যে সরকার বিভিন্ন ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে এবং মেয়েদের দ্বাদশ শ্রেণী পর্যন্ত শিক্ষা অবৈতনিক ও ষষ্ঠ শ্রেণী থেকে দ্বাদশ শ্রেণী পর্যন্ত বৃত্তির ব্যবস্থা করা হয়েছে। ছেলেরা পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত অবৈতনিক শিক্ষার সুবিধা পেয়ে থাকে।

দেশে শিশুদের চিকিৎসার জন্য বিশেষ কিছু সরকারি হাসপাতাল রয়েছে এবং সরকারি হাসপাতালগুলোতে ছেলে ও মেয়ে উভয়েই সমান সুবিধা পেয়ে থাকে।

যদিও মেয়েদের জন্য বিয়ের বৈধ বয়স ১৮ এবং ছেলেদের জন্য ২১, কিন্তু বাল্যবিবাহ একটি উল্লেখযোগ্য সমস্যা হিসেবেই বিরাজ করছে। বাল্যবিবাহের সঠিক পরিসংখ্যান পাওয়া কঠিন ছিল কারণ এখানে বিয়ের নিবন্ধন করা হয় মাঝে-মধ্যে এবং শিশুর প্রকৃত বয়স নির্ধারণ ও যাচাই করার জন্য জন্মের নিবন্ধনও সঠিকভাবে করা হয় না। ম্যাস লাইন মিডিয়া, একটি স্থানীয় শিশু অধিকার বিষয়ক বেসরকারী সংস্থা ২০০৪ সালে একটি জরিপ পরিচালনা করে যেটিতে আনুমানিক এই হিসাব দেয়া হয় যে শতরা ৪০ ভাগ বিয়েই বাল্যবিবাহ হিসেবে গণ্য করা যেতে পারে। বাল্যবিবাহ প্রতিরোধ করার লক্ষ্যে মেয়েশিশুদের স্কুলের যাবতীয় ব্যয় সরকার বৃত্তি দেয়ার প্রস্তাব করেছে যদি মা-বাবারা তাদের মেয়ে সন্তানদের বিয়ে ১৮ বছর পর্যন্ত পিছিয়ে দেন।

মানবাধিকার সংগঠনগুলোর ভাষ্য অনুযায়ী আলোচ্য বছর ২০৫ টি শিশু অপহরণ করা হয়, ৩১৪টি শিশুর অস্বাভাবিক মৃত্যু ঘটে এবং ৪৮৬-এর অধিক শিশু ধর্ষণ, যৌন নিপীড়ন, নির্যাতন, এবং এসিড আক্রমণের মত মারাত্মক ঘটনার শিকারে পরিণত হয়। শিশু অধিকার কর্মীদের মতে শিশু অধিকার বিষয়ে ক্রমবর্ধমান সচেতনতার কারণে আলোচ্য বছরে কিছু কিছু ক্ষেত্রে শিশু নির্যাতন কিছু পরিমাণে হ্রাস পেয়েছে।

মানবাধিকার পর্যবেক্ষকদের প্রদত্ত প্রতিবেদনে ইঙ্গিত দেয়া হয়েছে যে শিশু পরিত্যাগ করা, অপহরণ এবং শিশু পাচার একটি মারাত্মক ও ব্যাপক সমস্যা হিসেবে অব্যাহত রয়েছে। এ ব্যাপারে কিছু সুনির্দিষ্ট অগ্রগতি হওয়া সত্ত্বেও শিশু পাচার একটি সমস্যা হিসেবেই বিরাজ করছে (অনুচ্ছেদ ৫, পাচার দ্রষ্টব্য)।

ব্যাপক দারিদ্র্যের কারণে অনেক শিশুই অত্যন্ত কম বয়সে কাজ শুরু করতে বাধ্য হয়। এর ফলে প্রায়ই শিশুদের ওপর নির্যাতন হয়। বাসাবাড়ির কাজে নিয়োজিত শিশুদের সাথে তাদের চাকুরীদাতারা দুর্ব্যবহার করে। বাসাবাড়িতে যারা কাজ করে অনেক সময় সেই শিশু কাজের মেয়েদেরকে প্রায় ক্রীতদাসের মতো এবং পতিতার মতও ব্যবহার করা হয়। (অনুচ্ছেদ ৬.গ এবং ৬.ঘ দ্রষ্টব্য)। কর্মস্থলে শিশুদের মারাত্মকভাবে আহত বা নিহত হবার মতো ঘটনাও ঘটেছে।

সরকারী সংবাদ সংস্থা বাসস এর ২০০২ সালে প্রকাশিত এক রিপোর্টে জানা যায় যে দেশে গৃহহীন শিশুর সংখ্যা ছিল চার লাখ। এদের মধ্যে ১ লাখ ৫০ হাজার শিশু তাদের মা-বাবা সম্পর্কে কিছু জানে না। যে সকল শিশুর মা-বাবা কারারুদ্ধ তাদের জন্য বিদ্যমান সুযোগ সুবিধাদি অত্যন্ত কম।

মানুষ পাচার

মানুষ পাচার আইনত নিষিদ্ধ। কিন্তু মানুষ পাচার একটি গুরুতর সমস্যা হয়ে রয়েছে। অনৈতিক ও অবৈধ কাজে ব্যবহারের জন্য শিশু পাচারের দায়ে মৃত্যুদন্ড বা যাবজ্জীবন কারাদন্ডের বিধান রয়েছে এবং সরকার পাচারকারীদের বিরুদ্ধে দ্রুত আইনগত ব্যবস্থা নিচ্ছে। আলোচ্য বছরে বিশেষ আদালত নারী ও শিশু নির্যাতন সংক্রান্ত ৬৫ টি মামলার নিষ্পত্তি করে। এসব মামলায় ২৮ জনের বিরুদ্ধে মৃত্যুদন্ড থেকে শুরু করে ১০ বছরের কারাদন্ড পর্যন্ত দেয়া হয়। পাশাপাশি পুলিশ, কোস্ট গার্ড, বিডিআর, র‍্যাব এবং বেশ কয়েকটি এনজিও পাচারকালে বেশ কিছু ব্যক্তিকে উদ্ধার ও তাদের সহযোগিতা করে।

বিগত বছরে দেশ থেকে ব্যাপক হারে নারী ও শিশু পাচার করা হয়েছে। প্রাথমিকভাবে ভারত, পাকিস্তান, বাহরাইন, সংযুক্ত আরব আমিরাত (ইউএই), কুয়েত, এবং দেশের অভ্যন্তরে বিভিন্ন স্থানে এদের পাচার করা হয় প্রধানত: পতিতাবৃত্তি এবং কোন কোন ক্ষেত্রে দাসত্ব করার জন্য। বেশ কিছু বালককেও মধ্যপ্রাচ্যে পাচার করা হয় তাদেরকে উটের জকি হিসেবে ব্যবহার করা জন্য।

সরকারী সুত্রের হিসেব অনুযায়ী আলোচ্য বছরে আইন প্রয়োগকারী সংস্থাগুলো পাচারকারীদের কবল থেকে ১৩৯ জনকে উদ্ধার করেছে। স্থানীয় সরকার এনজিওসমূহ এবং সংযুক্ত আরব আমিরাতের সহযোগিতায় থেকে ১৬৪ জন উটের জকিকে দেশে ফেরত আনা হয়েছে, যাদের মধ্যে ১৫৯ জনকে তাদের মা-বাবার কাছে ফিরিয়ে দেয়া হয়েছে। বাকি পাঁচ জনকে বছর শেষে বিভিন্ন বেসরকারি আশ্রয়কেন্দ্রে রাখা হয়েছে। তারা বিভিন্ন সামাজিক ও বৃত্তিমুলক প্রশিক্ষণ দেয়া হচ্ছে এবং এনজিওগুলো তাদের পরিবারকে খুঁজে বের করার চেষ্টা করছে।

আলোচ্য বছর বাংলাদেশ ন্যাশনাল উইমেন লইয়ারস অ্যাসোসিয়েশন বা 'বিএনডব্লুএলএ' ৩১৪ জন পাচারকৃতকে দেশের ভিতর থেকে উদ্ধার করেছে এবং আরো ৩২ জনকে ভারত ও সংযুক্ত আরব আমিরাত থেকে দেশে ফিরিয়ে এনেছে। পাচারের অপরাধে ঠিক কতজনকে গ্রেফতার করা হয়েছে সে খবর জানা কষ্টকর, কেননা, পাচারকারীদের বিরুদ্ধে যে সব অভিযোগ আনা হয় তা অপেক্ষাকৃত কম অপরাধের জন্য -- যেমন যথাযথ ছাড়পত্র ছাড়াই অবৈধভাবে সীমান্ত অতিক্রম করা, ইত্যাদি। সেন্টার ফর উইমেন অ্যান্ড চাইল্ড সার্ভিসেস (সিডব্লুসিএস)-এর মতে, তথ্য অনুযায়ী পাচারকৃত ছেলেদের অধিকাংশেরই বয়স দশ বছরের নিচে এবং পাচারকৃত মেয়েদের অধিকাংশেরই বয়স ১১ থেকে ১৬-র মধ্যে।

ঠিক কত সংখ্যক নারী ও শিশুকে পাচার করা হয়েছে তার কোন সঠিক হিসাব নেই। ভাল চাকুরি বা বিয়ের লোভ দেখিয়ে অধিকাংশকে পাচার করা হয়। কাউকে কাউকে জোর করে দেশের বাইরে এবং দেশের অভ্যন্তরে দাস হিসেবে ব্যবহার করা হয়। দারিদ্র্যের চক্র থেকে বেরিয়ে আসার কোন পথ না পেয়ে কোন কোন পিতামাতা কখনো কখনো স্বেচ্ছায় তাদের ছেলেমেয়েদের কাজের জন্য অন্যত্র পাঠায়। অবিবাহিত মা, এতিম বা স্বাভাবিক পারিবারিক ছত্রছায়ার বাইরে যারা, তাদেরও পাচার হয়ে যাওয়ার বেশি ঝুঁকি থাকে। বিদেশে বসবাসকারী পাচারকারীরা কোন গ্রামে গিয়ে উপস্থিত হয় কোন মেয়েকে বিয়ে করে গন্তব্যে গিয়ে বিক্রি করে দেয়ার উদ্দেশ্যে। সেখানে বিক্রি করে দেয়া মেয়েটিকে জোর করে লাগানো হয় শ্রম দাসত্বে, দৈহিক কাজে বা পতিতাবৃত্তিতে। অপরাধীদের চক্রগুলোও কিছু মানুষ পাচারের কাজে নিয়োজিত থাকে। ভারতের সঙ্গে সীমান্তে, বিশেষ করে যশোর ও বেনাপোল সীমান্তে, নিয়ন্ত্রণ শিথিল থাকায় সহজেই অবৈধভাবে সীমান্ত অতিক্রম করা যায়।

পুলিশ ও স্থানীয় সরকার কর্মকর্তারা প্রায়ই নারী ও শিশু পাচার উপেক্ষা করে থাকে। এ ব্যাপারে নীরব থাকার জন্য তাদের সহজেই ঘুষ দেয়া যায় (অনুচ্ছেদ ১.গ ও ৫ দ্রষ্টব্য)।

পুলিশ সদর দফতরে স্থাপিত 'মানুষ পাচার পর্যবেক্ষণ সেল'-এর মাধ্যমে সরকার এর পাচার বিরোধী অভিযান অব্যাহত রেখেছে। স্বরাষ্ট্র সচিবের নেতৃত্বে পরিচালিত একটি আন্ত-মন্ত্রী পর্যায়ের কমিটি এই পুলিশ সেলের কার্যক্রম মনিটর করে এবং পাচার সংক্রান্ত মামলাগুলোর বিচারকার্যে সহায়তা করে। দেশের ৬৪টি জেলা সদরের প্রতিটিতেই গঠিত এই মনিটরিং ইউনিট পুলিশ সদর দপ্তরে হালনাগাদ/সর্বশেষ পরিসংখ্যান পাঠায়। তবুও এ সমস্যা সমাধানে সরকারের সীমাবদ্ধতা রয়েই গেছে। এই সমস্যা মোকাবেলায় সরকার যে সব প্রকল্প হাতে নিয়েছে তার মধ্যে রয়েছে পাচারের বিরুদ্ধে সচেতনতা অভিযান পরিচালনা করা, গবেষণা করা, প্রভাবিত করার চেষ্টা করা, এবং উদ্ধার ও পুনর্বাসন কর্মসূচী। এ ছাড়াও, সরকার ও নাগরিক সমাজের মধ্যে সমন্বয় ও সহযোগিতা বাড়ানোর লক্ষ্যে স্বরাষ্ট্র সচিব যে সব এনজিও মানুষ পাচার রোধে কাজ করছে সেগুলোর সাথে মাসে একবার করে বৈঠকে মিলিত হন।

পাচার হওয়া নারী ও শিশুদের প্রত্যাবাসন, পুনর্বাসন, এবং ফিরে আসা উটের জকিদের সামাজিক সমন্বয় সাধনের জন্য সরকার স্থানীয় এবং আন্তর্জাতিক এনজিওগুলোর সহায়তায় আন্তঃমন্ত্রী পর্যায়ের দু'টি বিশেষ কমিটি গঠন করে। যদিও সরকার পাচারের শিকার হওয়া ফিরে আসা নারী ও শিশুদেরকে সাহায্য-সমর্থন যুগিয়ে থাকে, কিন্তু সরকার পরিচালিত আশ্রয়কেন্দ্রগুলো ছিল সাধারণত অপর্যাপ্ত এবং অত্যন্ত বাজেভাবে পরিচালিত। প্রত্যাবাসিত পাচারের শিকারদেরকে সরকার যত্ন ও পরিচর্যার জন্য বেসরকারী আশ্রয়কেন্দ্রে পাঠিয়েছে।

অনেক এনজিও এবং সামাজিক সংগঠন প্রতিরোধ প্রচেষ্টা, গবেষণা, উপাত্ত সংগ্রহ, ডকুমেন্টেশন, প্রচার, সচেতনতা সৃষ্টি, নেটওয়ার্কিং, আন্তঃসীমান্ত সহযোগিতা, আইন প্রয়োগ, উদ্ধার, পাচারকৃতদের পুনর্বাসন, এবং আইন সংস্কারের কাজে নিয়োজিত রয়েছে। গ্রাম পর্যায়ে জন্ম এবং বিবাহের রেকর্ড না থাকার সমস্যা সত্ত্বেও কিছু পাচার মামলার বিচার হয়েছে। আশ্রয় কেন্দ্রের আসন সংখ্যা বৃদ্ধি এবং পুনর্বাসন কর্মসূচী উন্নয়নের ক্ষেত্রেও কিছু সাফল্য অর্জিত হয়েছে।

প্রতিবন্ধী নাগরিকবৃন্দ

বাংলাদেশের আইনে শারীরিক প্রতিবন্ধীদের প্রতি সমান আচরণ ও বৈষম্য থেকে সুরক্ষার বিধান রয়েছে। তবে বাস্তবে প্রতিবন্ধীরা সামাজিক ও অর্থনৈতিক বৈষম্যের শিকার। আইনে প্রতিবন্ধীদের শারীরিক অক্ষমতা প্রতিরোধ, চিকিৎসা, শিক্ষা, পুনর্বাসন ও চাকুরি, যানবাহনে সমান প্রবেশাধিকার এবং তাদের পক্ষে কথা বলার ওপর মনোনিবেশ করা হয়েছে।

যে সব সরকারী সংস্থা শারীরিকভাবে প্রতিবন্ধী নাগরিকদের অধিকার রক্ষা করার দায়িত্বে নিয়োজিত ছিল সেগুলো হলো সমাজ কল্যাণ মন্ত্রণালয়, সমাজ সেবা অধিদপ্তর এবং প্রতিবন্ধীদের উন্নয়ন বিষয়ক জাতীয় ফাউন্ডেশন। সরকারী কর্মকর্তা ও সংশ্লিষ্ট এনজিও সদস্যদের নিয়ে সমাজ কল্যাণ মন্ত্রণালয় একটি টাস্ক ফোর্স গঠন করেছে। প্রতিবন্ধীদের সার্বিক কল্যাণ পরিস্থিতি উন্নয়নের লক্ষ্যে এই টাস্ক ফোর্স ২০০৪ সালে একটি এ্যাকশন প্ল্যান প্রণয়ন করে যা বর্তমানে মন্ত্রণালয়ের অনুমোদনের অপেক্ষায় রয়েছে।

মানসিক প্রতিবন্ধী অথবা মানসিক রোগীদের চিকিৎসার জন্য সরকারী যে সব সুযোগ-সুবিধা রয়েছে, সেগুলোও অপর্যাপ্ত। তবে, শারীরিক প্রতিবন্ধীদের চিকিৎসা ও বৃত্তিমূলক পুনর্বাসনের ক্ষেত্রে বেসরকারী উদ্যোগে গৃহীত বেশ কয়েকটি প্রতিষ্ঠান রয়েছে।

আদিবাসী নাগরিকবৃন্দ

উপজাতীয় জনগণের নিজেদের ভূমি ব্যবহার সম্পর্কিত সিদ্ধান্তকে প্রভাবিত করার খুব সামান্যই ক্ষমতা আছে। ১৯৯৭ সালে সাক্ষরিত পার্বত্য চট্টগ্রাম (সিএইচটি) শান্তি চুক্তি সেখানকার ২৫ বছরের বিদ্রোহের অবসান ঘটিয়েছে, যদিও সেখানে আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতির সমস্যা এবং মানবাধিকার লঙ্ঘনের অভিযোগ অব্যাহতই ছিল। ভূমি কমিশনের দায়িত্ব হচ্ছে উপজাতি ও বাঙ্গালী বসতি স্থাপনকারীদের মধ্যে ভূমি সম্পর্কিত বিরোধের মীমাংসা করা। বিদ্রোহের সময় যে সব উপজাতীয় নাগরিক সংশ্লিষ্ট এলাকা ছেড়ে চলে গিয়েছিল, তাদেরকে সহায়তা প্রদানের ক্ষেত্রে তেমন কোন অগ্রগতি না হওয়ায় উপজাতীয় নেতারা অসন্তোষ প্রকাশ করেছেন।

একটি মানবাধিকার সংগঠনের মতে, আলোচ্য বছরে পার্বত্য চট্টগ্রাম এলাকায় সশস্ত্র সংঘর্ষে ২৫ ব্যক্তি নিহত হয়েছে এবং ৭১ জন আহত হয়েছে। একই সময়ে ৮১ ব্যক্তি অপহৃত হয়েছে, দুই জন মহিলাকে ধর্ষণ করা হয়েছে এবং ৩৫ জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। ২০০৪ সালে খাগড়াছড়ি ও রাঙামাটিতে অধিকাংশ অপহরণের জন্য পিসিজেএসএস ও শান্তি চুক্তির বিরোধিতাকারী সংগঠন ইউনাইটেড পিপলস ডেমোক্রেটিক ফোরাম (ইউপিডিএফ) পরস্পরকে দায়ী করেছিল। ওই বছরেরই ফেব্রুয়ারি মাসে একদল সশস্ত্র যুবক নানিয়ার চরের শবেকং এলাকার একটি বিয়ের অনুষ্ঠান থেকে ইউপিডিএফ এর সাতজন সদস্যকে অপহরণ করে। রাঙ্গামাটিতে বাঙ্গালী ও উপজাতীয়রাও সন্ত্রাসের সঙ্গে জড়িত রয়েছে বলে জানা গেছে।

অন্যান্য এলাকার উপজাতীয় মানুষও বাঙ্গালী মুসলমানদের কাছে তাদের জমি হারানোর বিষয়টি উল্লেখ করেছেন। আদিবাসী গোষ্ঠীদের প্রতিরোধ প্রচেষ্টা সত্ত্বেও মৌলভি বাজার এবং মধুপুর বন এলাকায় আদিবাসীদের মালিকানাধীন জমিতে সরকার ইকো-পার্ক এবং ন্যাশনাল পার্কের কাজ শুরু করে।

অন্যান্য সামাজিক শোষণ ও বঞ্চণা

আইনে যে কোন পুরুষ, নারী বা পশুর সঙ্গে ভিন্ন ধরনের যৌন কর্মের জন্য শাস্তির বিধান রয়েছে। এই আইনের প্রয়োগ খুবই বিরল। মানবাধিকার সংগঠন 'হিউম্যান রাইট্স ওয়াচ' (এইচআরডব্লু)-এর মতে, সমকামীদের বিরুদ্ধে সামাজিক বঞ্চনার কারণে সমকামীরা পুলিশ ও স্থানীয় অপরাধীদের দ্বারা ধর্ষণসহ নানা ধরনের নির্যাতনের শিকার হয়। 'এইচআরডব্লু'-র মতে সমকামীরা প্রায় সময়ই চাঁদাবাজদের হুমকীর শিকার হয়। 'এইচআরডব্লু' জানায় এছাড়া যারা এইচআইভি প্রতিরোধ ও এইচআইভি/এইড্সের ঝুঁকিপূর্ণ বিস্তারের বিরুদ্ধে কাজ করে তারাও নানা ভাবে সামাজিক বঞ্চনার শিকার হয়।

অনুচ্ছেদ ৬

শ্রমিকদের অধিকার

ক. সমিতি করার অধিকার

সংবিধানে বলা হয়েছে যে, কোন ব্যক্তির সমিতিতে যোগদান করার এবং সরকারের অনুমতি নিয়ে সমিতি গঠন করার অধিকার রয়েছে। তবে বাস্তবে সরকার এটার প্রতি সব সময় শ্রদ্ধাশীল নয়। দেশে মোট শ্রমজীবীর সংখ্যা প্রায় ৬ কোটি ৫০ লাখ। এর মধ্যে ১৮ লাখ নানা ইউনিয়নের সাথে যুক্ত। এই সব ইউনিয়নের বেশীরভাগ আবার কোন না কোন রাজনৈতিক দলের সাথে যুক্ত। ইনফরমাল সেক্টর বা অপ্রচলিত খাতে কর্মরত শ্রমজীবী সম্পর্কে নির্ভরযোগ্য কোন পরিসংখ্যান নেই। এই খাতে কর্মরত রয়েছেন দেশের মোট শ্রমশক্তির ৭৫ থেকে ৮০ শতাংশ। ইউনিয়ন নিষিদ্ধ করা বিষয়ে বিশেষ আইনের অধীনে দেশের রফতানি প্রক্রিয়াকরণ এলাকায় (ইপিজেড) ইউনিয়ন গঠন নিষিদ্ধ করা হয়েছে। আইন অনুযায়ী কোন কারখানায় ইউনিয়ন নিবন্ধীকরণ করতে হলে তাতে সেখানকার শ্রম শক্তির ৩০ শতাংশের অংশগ্রহণ আবশ্যক করা হয়েছে। তাছাড়া, নিবন্ধীকরণের আগে সম্ভাব্য ইউনিয়নকর্মীদের সদস্য সংগ্রহের প্রচারণার মতো অনেক কর্মকান্ডে অংশগ্রহণ করা থেকেও নানা অজুহাতে বিরত রাখা হয়। এই সময়ে মালিকরা শ্রমিকদের বিরুদ্ধে কোন প্রতিশোধমূলক ব্যবস্থা নিলেও তার বিরুদ্ধেও কোন আইনী সুরক্ষা নেই। শ্রমিক আন্দোলনের কর্মীরা প্রতিবাদ জানিয়েছেন যে, এই বিধান শ্রমিকদের সংগঠন করার, বিশেষ করে আলোচ্য বছরে ক্ষুদ্র প্রতিষ্ঠানগুলোতে এবং বেসরকারী খাতে সংগঠন করার স্বাধীনতা মারাত্মকভাবে খর্ব করছে। একই কারণে আন্তর্জাতিক শ্রম সংগঠন (আইএলও) ট্রেড ইউনিয়নের নিবন্ধীকরণের জন্য ৩০ শতাংশ শ্রমিকের অংশগ্রহণ বাধ্যতামূলক করার বিধানটি সংশোধনের জন্য সরকারের কাছে সুপারিশ করেছে। বিভিন্ন কর্মস্থলে বিভিন্ন মালিকের কারখানায় কর্মরত শ্রমিকদের নিয়ে ইউনিয়ন গঠন করা হলে তার নিবন্ধীকরণ না করার যে আইনগত বিধান আছে তা সংশোধন করার জন্যও এ বছর 'আইএলও' সরকারের কাছে সুপারিশ করেছে। আনুমানিক ৫,৪৫০টি শ্রমিক ইউনিয়নের মধ্যে প্রায় ১৫ শতাংশ সরকারীভাবে নিবন্ধিত ২৫টি জাতীয় ট্রেড ইউনিয়ন কেন্দ্রের সাথে সংশিষ্ট বা অঙ্গীভূত। অনিবন্ধিত আরো কয়েকটি জাতীয় ট্রেড ইউনিয়ন (এনটিইউ) কেন্দ্র রয়েছে।

শ্রমিক ইউনিয়নগুলোর চরিত্র কঠোর ভাবে রাজনৈতিক এবং রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন সংগঠনগুলোতেই এগুলো সবচেয়ে শক্তিশালী। যেমন, সরকার পরিচালিত চট্টগ্রাম বন্দরে। ইউনিয়নগুলোর রাজনৈতিক চরিত্রের কারণে সিভিল সার্ভিস এবং নিরাপত্তা বাহিনীর সদস্যদের এগুলোতে অংশগ্রহণ নিষিদ্ধ। সরকারী ও বেসরকারী পর্যায়ের শিক্ষকবৃন্দকেও ট্রেড ইউনিয়ন গঠন করার অনুমতি দেয়া হয়নি।

'রেজিস্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়ন্স' শ্রম আদালতের অনুমতি সাপেক্ষে যে কোন ট্রেড ইউনিয়নের রেজিস্ট্রেশন বাতিল করতে পারেন। তবে আলোচ্য বছর এ ধরনের কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে বলে জানা যায়নি। শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশে নিবন্ধিত ইউনিয়ন বা ইউনিয়ন কর্মকর্তাদের দেওয়ানি দায়দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি দেয়ার বিধান রয়েছে। এই সব বিধানের প্রয়োগ অবশ্য অসম। অতীতে পরিবহন অবরোধের মতো অবৈধ কর্মকান্ডের জন্য পুলিশ ইউনিয়ন কর্মকর্তাদের বিশেষ ক্ষমতা আইনে বা নিয়মিত ফৌজদারী বিধিতে গ্রেফতার করেছে।

ট্রেড ইউনিয়ন কর্মীদেরকে 'আইএলও'র সভায় যোগ দিতে বিদেশ ভ্রমণের জন্য সরকারের অনুমতি সংগ্রহ করতে হয়।

সমিতি করার অধিকার সংক্রান্ত 'আইএলও'-র বিশেষজ্ঞ কমিটি 'ইন্টারন্যাশনাল কনফেডারেশন অব ফ্রি ট্রেড ইউনিয়ন' (আইসিএফটিইউ) শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশে কতিপয় পরিবর্জন, ইউনিয়নের সদস্যপদ লাভে এবং ইউনিয়ন কর্মকর্তা পদে নির্বাচিত হবার ক্ষেত্রে কতিপয় বাধা নিষেধ, সরকারী কর্মকর্তা সমিতির কর্মকান্ডেও ওপর বাধা-নিষেধ, রফতানি প্রক্রিয়াকরণ এলাকায় যৌথভাবে সংগঠিত হবার এবং দর কষাকষি করার অধিকারের ওপর বাধা-নিষেধ এবং হরতাল করার অধিকারের ওপর বাধা-নিষেধ লক্ষ্য করেছে।

খ. সংগঠিত হবার এবং যৌথ দরকষাকষি করার অধিকার

শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশে মালিকদের দ্বারা ইউনিয়ন কর্মী ও সংগঠকদের প্রতি বৈষম্য করার যথেষ্ট সুযোগ রয়েছে। কার্যতঃ বেসরকারী খাতের নিয়োগকর্তারা সাধারণত কখনো কখনো স্থানীয় পুলিশের সহযোগিতায় যে কোন ধরনের ইউনিয়ন কর্মকান্ডকে নিরুৎসাহিত করে থাকে। ট্রেড ইউনিয়ন রেজিস্ট্রার বৈষম্যের অভিযোগ সম্পর্কে রায় দিয়ে থাকেন এবং অনেক মামলায় শ্রম আদালত ইউনিয়ন কর্মকান্ডের জন্য বরখাস্তকৃত শ্রমিকদের পুনর্বহালের আদেশ দিয়েছেন। যাহোক, মামলা পুঞ্জীভূত হয়ে থাকার কারণে শ্রম আদালতের কার্যকারিতা সার্বিকভাবে ব্যাহত হয়েছে। এই সব পুঞ্জীভূত মামলার সংখ্যা হ্রাস করার লক্ষ্যে বিরোধ নিষ্পত্তির বিকল্প কৌশল কার্যকর করা শুরু হয়েছে।

রফতানি প্রক্রিয়াকরণ এলাকা (ইপিজেড) বাদে অন্যত্র শ্রমিকদের যৌথ দর কষাকষি বৈধ তবে শর্ত থাকে যে রেজিস্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়ন কর্তৃক যৌথ দর কষাকষির এজেন্ট হিসেবে বৈধভাবে রেজিস্ট্রিকৃত ইউনিয়নই কেবল তাদের প্রতিনিধিত্ব করতে পারবে। ওষুধ শিল্প, পাট শিল্প বা বস্ত্র শিল্পের মতো বড় বড় বেসরকারী প্রতিষ্ঠানে যৌথ দর কষাকষি ঘটে থাকে। তবে বেকারত্বের উচ্চ হারের কারণে শ্রমিকরা চাকুরীর নিরাপত্তার কথা চিন্তা করে যৌথ দর কষাকষিতে যায় না । ক্ষুদ্র বেসরকারী প্রতিষ্ঠানগুলোতে সাধারণতঃ যৌথ দর কষাকষি হয় না।

আইনে শ্রমিকদের ধর্মঘট করার অধিকারের সুনির্দিষ্ট স্বীকৃতি নেই। তবে ধর্মঘট হচ্ছে শ্রমিকদের প্রতিবাদের একটি সাধারণ পদক্ষেপ এবং ১৯৬৯ সালের শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশে ধর্মঘটকে নিষ্পত্তি হয়নি এমন সব বিরোধ নিরসনের একটি বৈধ পন্থা হিসেবে স্বীকৃতি প্রদান করা হয়েছে। এছাড়া বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলো তাদের রাজনৈতিক দাবি আদায়ের লক্ষ্যে সরকারের ওপর চাপ প্রয়োগের জন্য সাধারণ ধর্মঘটের পথ অবলম্বন করেছে। পেশাগত সমিতির আওতায় সংগঠিত কিছু চাকুরীজীবি অথবা অনিবন্ধিত ইউনিয়ন এ বছর ধর্মঘট করেছে।

অত্যাবশ্যকীয় চাকুরী অধ্যাদেশের আওতায় অত্যাবশ্যকীয় ঘোষিত যে কোন খাতে ৩ মাস ধর্মঘট নিষিদ্ধ করার ক্ষমতা সরকারকে দেয়া হয়েছে। আলোচ্য বছরে সরকার এই ক্ষমতা প্রয়োগ করা অব্যাহত রেখেছে। ২০০২ সাল থেকে মুলত প্রয়োগ শুরু হওয়া এই অধ্যাদেশটি আলোচ্য বছরেও সরকার বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড, ঢাকা বিদ্যুৎ বিতরণ কর্তৃপক্ষ, বাংলাদেশ বিমান, চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ, এবং বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশন-এর ওপর প্রয়োগ করা অব্যাহত রাখে।

২০০৩ সালে সরকার উৎপাদন চলাকালীন পাটকলগুলোতে যৌথ দর কষাকষি নিষিদ্ধ ঘোষণা করে। অতীতে সরকার এই নিষেধাজ্ঞা জাতীয় বিমান সংস্থার বৈমানিক, পানি সরবরাহ শ্রমিক এবং শিপিং

কর্মচারীদের ওপর প্রয়োগ করে। তিন মাস পর পর এই নিষেধাজ্ঞা সরকার পুনরায় জারি করতে পারে। কোন ধর্মঘট বা লক আউট শুরুর আগে বা পরে সেটা নিষিদ্ধ করার ক্ষমতা সরকারের রয়েছে এবং সেই বিরোধ নিয়ে শ্রম আদালতে মামলা করার ক্ষমতাও সরকারের আছে।

শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশে আপোষ, মধ্যস্থতা এবং শ্রম আদালতের মাধ্যমে বিরোধ নিষ্পত্তির বিধান রাখা হয়েছে। বিরোধের নিষ্পত্তি না হলে ধর্মঘটে যাবার অধিকার শ্রমিকদের রয়েছে। যদি ৩০ দিন বা তার অধিক সময় ধরে ধর্মঘট চলে তাহলে সরকার ধর্মঘট নিষিদ্ধ ঘোষণা করে বিষয়টি নিষ্পত্তির জন্য শ্রম আদালতে পাঠাতে পারে; যদিও সাম্প্রতিক বছরগুলোয় এমনটি ঘটেনি।

দেশে রপ্তানী প্রক্রিয়াকরণ এলাকা (ইপিজেড) রয়েছে। ২০০৪ সালের জুলাই মাসে সংসদ 'ইপিজেড'গুলোতে সীমিত আকারে সংগঠন করাা অধিকার দিয়ে একটি বিল পাশ করে। আলোচ্য বছরে দেশের ৫টি রফতানি প্রক্রিয়াকরণ এলাকাকে (ইপিজেড) শ্রমিক নিয়োগ (স্থায়ী আদেশ) আইন, শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশ এবং কারখানা আইনের আওতা থেকে অব্যাহতি দেয়া হয়েছে। এই সব আইনের আওতায় শ্রমিকদেরকে যে সমিতি গড়ার অধিকার, যৌথভাবে দর কষাকষি করে মজুরি, কাজের সময়, নিরাপত্তা ব্যবস্থা এবং স্বাস্থ্য সুবিধাদি নির্ধারণের অধিকার দেয়া হয়েছে, সংশ্লিষ্ট ইপিজেড-এলাকার শ্রমিকরা সেগুলো থেকে বাদ পড়েছে। যদিও 'ইপিজেড' নীতিমালার মাধ্যমে 'ইপিজেড'-এর শ্রমিকদের জন্য এই সকল আইনের কয়েকটি ধারার বিকল্প বাস্তবায়ন করা হয়েছে, কিন্তু 'শ্রমিক প্রতিনিধি ও কল্যাণ কমিটি'-র (ডব্লুআরডব্লুসি) সদস্যদদেরকে 'ইপিজেড' কর্মকর্তারা অন্য কোন কারখানার 'ডব্লুআরডব্লুসি'-র সদস্যদের সাথে সাক্ষাৎ করার অনুমতি দেননি, কর্মদিবসের শেষে শ্রমিকদের নিজেদের সময়েও তাদেরকে বাইরের কোন শ্রম সংগঠনের সাথে দেখা করার অনুমতি দেননি এবং এমনকি 'ডব্লুআরডব্লুসি'-র সদস্যরা নিজেদের কারখানার অভ্যন্তরেও দেখা করার সময় করতে পারেননি। 'ডব্লুআরডব্লুসি'-র যৌথ দর কষাকষি করার কোন অধিকার নেই কিন্তু কাজের পরিবেশ, উৎপাদন বাড়ানোর জন্য অর্থ প্রদান এবং শ্রমিকদের শিক্ষা কর্মসূচীর ব্যাপারে তারা কর্তৃপক্ষের সাথে আলাপ-আলোচনা করতে পারে।

আলোচ্য বছরে সাভার 'ইপিজেড'-এ অবস্থিত রিং শাইন ফ্যাক্টরির শ্রমিকদেরকে গ্রেফতার করা হয়, এবং তাদেরকে বের করে দিয়ে কারখানা বন্ধ করে দেয়া হয় যা 'ইপিজেড' আইনের পরিপন্থী। বছরের শেষে 'ইপিজেড' কর্মকর্তারা যথেষ্ট সংখ্যক প্রশিক্ষিত ও অভিজ্ঞ মধ্যস্থতাকারী নিয়োগ করেন নাই।

অন্যান্য অনেকগুলো কারখানাতেও কর্তৃপক্ষের তরফ থেকে শ্রমিকদের ভয়ভীতি দেখানোর মতো বেশ কিছু ঘটনা ঘটেছে। এছাড়া, নির্বাচন প্রক্রিয়া চলাকালে এবং নির্বাচনের পর কোন যথাযথ প্রক্রিয়া ছাড়াই শ্রমিকদের ও নির্বাচিত 'ডব্লুআরডব্লুসি' সদস্যদের সাময়িক বরখাস্ত করা সহ নানা ধরনের নির্যাতন ও অনৈতিক ঘটনা ঘটেছে যা 'ইপিজেড' আইনের পরিপন্থী। আইনের অধীনে কর্তৃপক্ষ ও শ্রমিকদের কি কি দায়িত্ব ও কর্তব্য রয়েছে সে বিষয়ে 'ইপিজেড' কর্মকর্তারা কারখানা কর্তৃপক্ষকে সীমিত নির্দেশনা প্রদান করেছেন। শ্রমিক বিরোধের পর একটি শ্রমিক ব্যবস্থাপনা চুক্তি হয় যার আওতায় এ কথা বলা হয়েছে যে কর্তৃপক্ষ ও শ্রমিকদেরকে আইনের অধীনে তাদের স্ব স্ব ভূমিকায় ব্যাপক প্রশিক্ষণ দেয়া হবে।

গ. বলপূর্বক বা বাধ্যতামূলক শ্রমের ওপর নিষেধাজ্ঞা

সংবিধানে শিশুশ্রমসহ বলপূর্বক বা বাধ্যতামূলক শ্রম নিষিদ্ধ, তবে সরকার এই নিষেধাজ্ঞা কার্যকরভাবে প্রয়োগ করেনি। বলপূর্বক শ্রমের ঘটনা যাতে না ঘটে সেজন্য 'ফ্যাক্টরিজ অ্যাক্ট' এবং 'শপ্স অ্যান্ড এস্টাব্লিশমেন্ট অ্যাক্ট'-এ কলকারখানা পরিদর্শনের ব্যবস্থা আছে, তবে তা কঠোরভাবে কার্যকর করা হয় না অংশতঃ সম্পদের স্বল্পতার কারণে। বড় বড় শিল্প প্রতিষ্ঠানে শ্রম দাসত্ব নেই। অবশ্য অনেক শিশুসহ অসংখ্য গৃহ পরিচারক-গৃহপরিচারিকা দাসত্বের পরিবেশে কাজ করে। তাদের অনেকে দৈহিক নিপীড়নের শিকার হয় এবং এ কারণে কখনো কখনো তাদের মৃত্যুও ঘটে থাকে। গৃহ পরিচারিকাদের ওপর অব্যাহত সহিংসতার খবর পাওয়া গেছে। সরকার অতীতে ভৃত্যদের ওপর নির্যাতনকারী গৃহকর্তাদের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা নিয়েছে। তবে অনেক গরীব বাবা-মা আর্থিক ক্ষতিপূরণ নিয়ে ঘটনার নিষ্পত্তি করেছেন। শিশু ও নারী পাচার একটি সমস্যা হিসেবেই বিরাজ করেছে (অনুচ্ছেদ ৫ এবং ৬. চ দ্রষ্টব্য)।

ঘ. শিশু শ্রম পরিস্থিতি এবং চাকুরীর ন্যূনতম বয়স

ব্যাপক দারিদ্র্যের কারণে অনেক শিশু খুব অল্প বয়সে কাজ করতে শুরু করে। ২০০৩ সালে প্রকাশিত সরকারের জাতীয় শিশু শ্রমিক জরিপের হিসাব অনুযায়ী পাঁচ থেকে ১৪ বছর বয়সের আনুমানিক ৩২ লাখ শিশু আলোচ্য বছরে শ্রমে নিয়োজিত ছিল। ২০০টি বিভিন্ন ধরনের কাজে শিশুদের নিয়োজিত থাকতে দেখা যায়। এগুলোর মধ্যে ৪৯টিকে শিশুর দৈহিক ও মানসিক কল্যাণের জন্য ক্ষতিকর বলে বিবেচনা করা হয়। কখনো কখনো শিশুরা কর্মস্থলে গুরুতরভাবে আহত হয় বা মারা যায়। শিশুরা প্রায়শঃই ছোট ও প্রান্তিক কৃষি জমিতে পরিবারের অন্য সদস্যদের সাথে কাজ করে। সাধারণতঃ তাদেরকে কাজ করতে হয় দীর্ঘ সময় ধরে এবং তারা মজুরিও পায় কম। কখনও কখনও তাদের কাজের পরিবেশও থাকে ঝুঁকিপূর্ণ। অনেক শিশুশ্রমিক বিড়ি শিল্পে কাজ করে। এছাড়াও ১৮ বছরের নীচের অনেক শিশু চামড়া কারখানার অথবা ইট ভাঙ্গার মত ঝুঁকিপূর্ণ কাজে নিয়োজিত থাকে। খবর পাওয়া গেছে যে কয়েক হাজার শিশু ঝুঁকিপূর্ণ পরিবেশে দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলীয় বাগেরহাট জেলার দ্বীপাঞ্চলে মৎস্য খামারগুলোতে বছরে পাঁচ মাস ধরে কাজ করে। কোস্ট গার্ড সদস্যরা সময় সময়ে এসব শিশুদের উদ্ধার করে তাদের বাড়িতে পাঠিয়ে দেয়।

শিশুরা নিয়মিতভাবে ঘর-বাড়ির কাজ করে। যে সব গৃহকর্তা ভৃত্যদের ওপর অত্যাচার করেছে অতীতে সরকার তাদের বিরুদ্ধে ফৌজদারী আইনে ব্যবস্থা নিয়েছে। দেশের প্রচলিত আইনে প্রতিটি শিশুর ৫ম শ্রেণী পর্যন্ত বা ১০ বছর বয়স পর্যন্ত লেখা পড়া করা বাধ্যতামূলক। এই আইন কার্যকরভাবে বলবৎ করার কোন প্রক্রিয়া নেই।

রপ্তানিভিত্তিক পোশাক শিল্পের বাইরে শিশু শ্রম বিষয়ক আইন কার্যত বলবৎ করা হয় না। শিশুশ্রম বিষয়ক বিধান লঙ্ঘনের জন্য যে জরিমানার বিধান রয়েছে তার পরিমাণ খুবই সামান্য, ৪ ডলার থেকে ১০ ডলার পর্যন্ত (২৭৫ টাকা থেকে ৭০০ টাকা পর্যন্ত)।

পোশাক খাত থেকে শিশুশ্রম নির্মূল করার ঘোষিত লক্ষ্য নিয়ে বাংলাদেশ পোশাক প্রস্তুতকারক ও রপ্তানীকারক সমিতি (বিজিএমইএ), শ্রম দফতর এবং আইএলও যৌথভাবে ২০০৩ সালে বিজিএমইএ সদস্যভুক্ত ২,২০০টি কারখানা তারা পরিদর্শন করে। এই পরিদর্শনে দেখা যায় এই সব কারখানার শতকরা এক ভাগ শিশু শ্রমিক নিয়োগ করেছে। ১৯৯৭ সালে যেখানে ২৫ শতাংশ রপ্তানিমুখী পোশাক শিল্প কারখানা শিশু শ্রম ব্যবহার করেছে তা থেকে এই হার অনেক কমে এসেছে।

সরকারের অপ্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা পরিদপ্তর, আন্তর্জাতিক সংস্থা ও কিছু সংখ্যক সহযোগী এনজিও-র সহযোগিতায় সারা দেশের শহরাঞ্চলের বস্তিতে কর্মরত শিশুকে প্রাথমিক শিক্ষা দেয়ার উদ্দেশ্যে একটি কার্যক্রম চালু রয়েছে। এরা প্রধানত শ্রমজীবী শিশু। সরকার ১৯৯৪ সাল থেকেই আইএলও-আইপিইসি (ইন্টারন্যাশনাল প্রোগ্রাম অন দি ইলিমিনেশন অব চাইল্ড লেবার)-এর সদস্য। একটি বিদেশী সরকার ও আইএলও-র যৌথ কর্মসূচীর অধীনে পাঁচটি নির্দিষ্ট শিল্প কারখানায় নির্মম শিশু শ্রম বিলোপের উদ্দেশ্যে ৬০ লাখ ডলারের একটি প্রকল্প গ্রহণ করা হয়। এই পাঁচটি নির্দিষ্ট শিল্প হচ্ছে: বিড়ি উৎপাদন, দিয়াশলাই উৎপাদন, চামড়া শিল্প, নির্মাণ শিল্প, এবং গৃহ ভৃত্য। ২০০৩ সালে ১৯,৮৭৪ জন শিশুকে ঝুঁকিপূর্ণ কাজ থেকে সরিয়ে নেয়া হয়েছে; ১৯,৫০৮ জন শিশুকে অপ্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা গ্রহণের জন্য স্কুলে পাঠানো হয়েছে; ৭,৬২৩ জন শিশু বৃত্তিমুলক প্রশিক্ষণের পূর্ব পর্যায়ে শিক্ষা গ্রহণ করছে এবং ৩,০৬০ জন শিশু বৃত্তিমুলক প্রশিক্ষণের পূর্ব পর্যায়ে রয়েছে। ৫১টি বিড়ি ও ইট ভাঙ্গার কারখানার মালিক তাদের কর্মস্থলকে "শিশু শ্রমিক মুক্ত" ঘোষণা করেছে।

ঙ. কাজের গ্রহণযোগ্য পরিবেশ

জাতীয় ভিত্তিতে কোন ন্যুনতম মজুরি নেই। এর পরিবর্তে মাঝে মধ্যে গঠিত মজুরি কমিশন শিল্পভেদে দক্ষতা বিচার করে মজুরি ও ভাতা নির্ধারণ করে থাকে। বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে বেসরকারী খাতের নিয়োগকর্তারা এই বেতন কাঠামো মানেনি। দৃষ্টান্ত হিসাবে বলা যায়, অনেক পোশাক কারখানা আইনসিদ্ধ সর্বনিম্ন মজুরি দেয়নি। ছোট ছোট অনেক পোশাক কারখানায় শ্রমিকরা দেরীতে তাদের মজুরি পেয়েছেন এবং তিন মাসের শিক্ষানবিশী কাল পেরিয়ে যাবার অনেক পরেও অনেক শ্রমিক শিক্ষানবিশী কালের বেতন পেয়েছেন। ২০০১ সালে 'আইসিএফটিইউ' জানায়, শতকরা ২১ দশমিক ৭ ভাগ টেক্সটাইল শ্রমিক সবচেয়ে কম বেতন পেয়েছেন। রফতানি প্রক্রিয়াকরণ এলাকায় কর্মরত শ্রমিকরা বাইরের শ্রমিকদের তুলনায় সাধারণত বেশী মজুরি পেয়েছেন। কারখানার এক জন দক্ষ শিল্প শ্রমিকের ঘোষিত মাসিক ন্যুনতম মজুরি হলো ইপিজেড এলাকায় ৫৮ ডলার (৩,৪০০ টাকা) ইপিজেড এলাকার বাইরে আনুমানিক ৪৫ ডলার (২,৬৫০ টাকা)। এই মজুরি একজন শ্রমিকের পরিবার নিয়ে শোভনীয় জীবনমান রক্ষার জন্য যথেষ্ট নয়।

আলোচ্য বছরের সেপ্টেম্বর মাসে সরকার পুনরায় পাঁচ দিনে, ৮০ ঘন্টার কর্ম সপ্তাহ নির্ধারণ করে। সাপ্তাহিক ছুটির দিন নির্ধারণ করা হয় শুক্র ও শনিবার। এই আইন সরকারী কর্মচারী, ব্যাংক, বেসরকারী সংস্থা এবং অন্যান্য অফিস কর্মীদের ক্ষেত্রেও প্রয়োগ করা হয়েছে। কারখানার শ্রমিকদেরকে পুরনো আইনের অধীনে ৪৮ ঘন্টা কর্মসপ্তাহই কাজ করতে হয়েছে। সর্বাধিক ১২ ঘন্টার ওভারটাইমসহ তাদের সাপ্তাহিক ছুটি এক দিন। এই আইন তেমনভাবে কার্যকর করা হয়নি।

কারখানা আইনে কর্মস্থলে নামমাত্র স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা মানদন্ড স্থির করা হয়েছে। এই আইন ব্যাপক, কিন্তু নিয়োগকারীরা তা বহুলাংশে উপেক্ষা করেছে। আইনের বিধান কার্যকর করার জন্য শ্রমিকরা আইনগত ব্যবস্থা নিতে পারে। তবে প্রকৃত পক্ষে গুটিকয়েক মামলার বিচার সম্পন্ন হয়েছে। শ্রম মন্ত্রণালয়ের শ্রম পরিদর্শকদের সংখ্যাল্পতা ও তাদের মধ্যে ব্যাপক দুর্নীতি ও অযোগ্যতার কারণে তাদের দ্বারা আইন প্রয়োগ জোরালো নয়। বেকারত্বের উচ্চ হার এবং আইনের অপর্যাপ্ত প্রয়োগের কারণে শ্রমিকরা বিপজ্জনক কাজের

পরিবেশ সংশোধনের দাবী করলে বা বিপজ্জনক বলে অনুমিত কাজে অংশগ্রহণের অস্বীকৃতি জানালে তাদের চাকুরি হারানোর ঝুঁকি থাকে।

==========

জিআর/ ২০০৬

দ্রষ্টব্য: *এই নিবন্ধের ইংরেজি ভাষ্য 'আমেরিকান সেন্টার'-এ পাওয়া যাবে। যদি আপনি ইংরেজি ভাষ্যটি পেতে আগ্রহী হন, তবে 'আমেরিকান সেন্টার' প্রেস সেকশনে (টেলিফোন: ৮৮১৩৪৪০-৪, ফ্যাক্স: ৯৮৮৫৬৮৮; ই-মেইল:* DhakaPA@state.gov এবং *Website: dhaka.usembassy.gov (New) এ যোগাযোগ করুন।*